শায়খ ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফি

নারী যখন রানি

অ্যারাবিক লেখক

শায়খ ড. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আরিফি

প্রভাষক, কিং সউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদিআরব

ভাষান্তর

কথাসাহিত্যিক

মাওলানা মাহমুদ হাসান কাসেমি

প্রধান সম্পাদক, ইসলামিয়া সম্পাদনা পর্ষদ

নারী যখন রানি

শায়খ ড. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আরিফি
প্রভাষক, কিং সঊদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদিআরব

ভাষান্তর
মাওলানা মাহমুদ হাসান কাসেমি

প্রকাশনা
৩৫ [পয়ত্রিশ]

প্রকাশকাল
মার্চ ২০১৭

প্রকাশক
হুদহুদ প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৩৬৫৫৫৫৫, ০১৯৭৩ ৬৭৫৫৫৫

প্রচ্ছদ
শাহ ইফতেখার তারিক

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তণুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ২৬০ টাকা মাত্র

প্রারম্ভিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। তিনি আমাদের তৌফিক দিয়েছেন, এ জন্য আমরা কিছু কাজ করতে পারছি। এ পর্যন্ত আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। আলহামদু লিল্লাহ, সেগুলো মানুষের উপকারে আসছে বলে কিছু নিদর্শন দেখা যাচ্ছে।

সেই ধারাবাহিকতায় আজ আমরা নতুন আরেকটি পুস্তক পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছি। পুস্তকটি লিখেছেন, বর্তমান বিশ্বের অন্যতম গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় ব্যক্তি, বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফি। তিনি সৌদি আরবের কিং সউদ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, বাওয়ার্দী জামে মসজিদের খতীব। তা ছাড়া তিনি একজন বিশিষ্ট দাঈ। বিভিন্ন পন্থায় দাওয়াতের কাজ করে যাচ্ছেন। দাওয়াতের আধুনিক যত পদ্ধতি হতে পারে, সেগুলো তিনি সবই অবলম্বন করছেন এবং দিনরাত মেহনত করে যাচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর মেহনত কবুল করুন এবং তাঁর হায়াতের মধ্যে বরকত দান করুন।

বক্ষ্যমাণ পুস্তক তিনি মা-বোনদের উদ্দেশে লিখেছেন। এর মধ্যে তিনি অতীতের অনেক নারীর ঐতিহাসিক কর্মতৎপরতা তুলে ধরেছেন। যাতে বর্তমান যামানার নারীসমাজের মধ্যে কাজের জযবা পয়দা হয় এবং তারাও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

নারীসমাজ হচ্ছে রেলগাড়ির ইঞ্জিনের মতো। ইঞ্জিন যেদিকে যায়, গাড়ির বাকি কম্পার্টমেন্টগুলোও সেদিকে যায়। ইঞ্জিন যদি ভুল পথে রওনা হয়, তাহলে বাকি বগিগুলোও ভুল পথে চলতে বাধ্য, নারীসমাজও বিপথগামী হলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। এজন্যই খুব দরদ নিয়ে ডক্টর আরিফি এই পুস্তক নারীদের জন্য লিখেছেন। আমরা সেটা অনুবাদ করে বাঙালি মুসলমানদের সামনে পেশ করছি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এই মেহনত কবুল করুন। সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

বিনীত
মুহাম্মাদ আবদুল আলীম
মহাপরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন
১৫/০৬/১৪৩৮ হিজরি [১৫/০৩/১৭ ইং]

যেভাবে রানি হওয়ার কাহিনি শুরু

রাশিয়ান এক তরুণী। জন্ম খৃষ্টধর্মের রক্ষণশীল এক পরিবারে।

রুশ এক ব্যবসায়ী তাঁকে উপসাগরীয় অঞ্চলের কোনো এক দেশে ব্যবসায়িক এক সফরে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। বলে, সঙ্গে আরও অনেক তরুণী থাকবে। উদ্দেশ্য, সেখান থেকে কিছু বৈদ্যুতিক পণ্যক্রয় করে রাশিয়ার বাজারে বিক্রি করা। তরুণী এই প্রস্তাবে দেশ ভ্রমণের আনন্দ ছাড়া আর কিছুই ভাবে না। তাই সানন্দে বলে ওঠে, ঠিক আছে আমিও যাব। একদিন রওনা হয়ে যায় সবাই।

গন্তব্যে পৌঁছার পর ব্যবসায়ীর আসল চেহারা উন্মোচন হয়। নিয়ে আসা তরুণীদের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার প্রস্তাব দেয় সে। সঙ্গে সঙ্গে লোভও দেখায় অনেক। গাড়ি, বাড়ি ও বিশাল অর্থসম্পদের রঙিন স্বপ্ন দেখায়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচিতি পাওয়ার উৎসাহ দেয়। তার এই লোভনীয় অফারে ভেসে যায় সব তরুণী।

কিন্তু স্বীয়ধর্মের কট্টরপন্থী তরুণী এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ঘৃণাভরে।

ব্যবসায়ী তরুণীর এ প্রত্যাখ্যানে কোনো রাগ করে না। শুধু তাঁর দিকে তাকায় আড়চোখে। আর বলে, এই মেয়ে! এখানে তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো দাম নেই। এখানে তোমার কোনো মূল্য নেই। বুঝলে! গায়ের কাপড় ছাড়া তোমার সঙ্গে আছে কী আর? আমার কথায় রাজি না হওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ তোমার সামনে খোলা নেই। একটু ভেবে দেখো ভালো করে!

এভাবে তরুণীর ওপর শুরু হয় চাপাচাপি। তাঁর থাকার ব্যবস্থাও

করা হয় অন্য সব তরুণীর সঙ্গে খালি এক ফ্ল্যাটে। কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থকারী এ অসভ্য সবার পাসপোর্টও ছিনিয়ে নেয়।

দেখতে দেখতে সব তরুণীই যৌনখেলায় ভাসিয়ে দেয় গা। ব্যতিক্রম শুধু ওই এক তরুণীই। নিজের ইজ্জত ও সতীত্ব নিরাপদ রাখার সংগ্রামে সে থাকে অনড়। তার পাসপোর্ট চায় সে ফেরত। বলে, তাঁকে রাশিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু ব্যবসায়ী বলে, না, তা কক্ষনো হতে পারে না। তোমাকে থাকতে হবে এখানেই এবং মেনেও নিতে হবে সব শর্ত আমার।

এরপরও নিরাশ হয় না তরুণী। সে শুধু থাকে সুযোগের সন্ধানে। এসে যায় কাঙ্ক্ষিত সেই সুযোগ। ফ্ল্যাটে থাকা সব তরুণীই বের হয়ে যায় ঘুরতে। সে এই সুযোগে পুরো ফ্ল্যাট তন্নতন্ন করে তাঁর পাসপোর্ট খুঁজে। নিরাশ হতে হতে একসময় পেয়েও যায় পাসপোর্ট। মনে সাহস নিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে কিনা উঁকি দিয়ে দেখে। ধরা পড়ার আশঙ্কা কম। এখন কেউ নেই। সুতরাং এখানে আর থাকার কোনো অর্থ হয় না। কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে গোপনে বেরিয়ে পড়ে। দ্রুত এসে যায় রাস্তায়। গায়ের কাপড় ছাড়া কিছুই নেই তাঁর সঙ্গে। কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ায়। বুঝে উঠতে পারছে না যাবে কোথায়! করবে কী!

এখানে নেই কোনো স্বজন, নেই কোনো পরিবার-পরিজনের কেউ।

নেই টাকা-পয়সা।

নেই খাবার-দাবার।

নেই মাথা গুঁজার একটুখানি ঠাঁই।

কিন্তু এত কিছুর পরও সে থাকে শান্ত। কারণ, সে পেরেছে তাঁর সতীত্ব রক্ষা করতে। সে পেরেছে বিজয় লাভ করতে। বিজয় আসার ব্যাপারে সে ছিল সম্পূর্ণ নিশ্চিত। যার যত থাকে নৈতিক শক্তি, সে তত বেশি অনুভব করে প্রশান্তি । ঝড়ের কবলে পড়েও সে থাকে প্রশান্ত। এখন কি তাঁর জীবনে বয়ে যাচ্ছে না ঝড়! তবুও সে প্রশান্ত। মানুষ নামের এক জানোয়ার থেকে সে নিজের সতীত্ব রক্ষা করতে পেরেছে। সামনে হয়তো আরও আসবে ঝড়! আর সেই ঝড় পারবে কি তাঁকে কাবু করতে? না, পারবে না।

তরুণী দেখতে থাকে উদ্বেগমাখা চোখে এদিক-সেদিক। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ে এক যুবকের ওপর। যার সঙ্গে আছে তিনজন মহিলা কালো বোরকায় আবৃত। সম্ভবত এরা তার মা-বোন। এদের নিয়ে কোথাও যাচ্ছে যুবক। তরুণীর মন বলে, মোটামুটি নির্ভর করার মতোই এক যুবক। তাই এগিয়ে যায় ধীর পায়ে তাঁর দিকে।

রাশিয়ান ভাষায় কিছু বলে। কিন্তু যুবক বলে তাঁর ভাষা সে বুঝতে পারছে না । তখন তরুণী বলে, আপনি কি ইংরেজি জানেন?

যুবক বলে, হ্যাঁ, জানি।

মেয়েটি এবার কেঁদে কেঁদে বলে, আমি এক অসহায় প্রবাসিনী। আমার বাড়ি রাশিয়ায়। তারপর জড়িয়ে আসা কণ্ঠে এ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সব ঘটনা বলে তাঁকে। সবশেষে বিনয়ের সঙ্গে বলে, এখন আমি আমার দেশে ফিরে যেতে চাই। কিন্তু আমি এখন নিঃস্ব। কোনো টাকা-পয়সা নেই আমার কাছে। থাকার কোনো জায়গা নেই আমার। আমি আপনাদের কাছে কিছুই চাই না, চাই শুধু একটুখানি থাকার আশ্রয়। তাও দুই তিন দিনের জন্য। এর মধ্যেই আমি আমার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা উপায় বের করে নিব।

যে চারজনের কাছে তরুণী আশ্রয় প্রার্থনা করছে, তারা মা-ভাই ও দুই বোন। যুবকের নাম খালেদ। তরুণীর অশ্রুভরা মিনতি

খালেদের মনে দাগ কেটে যায়। তারও চোখের পাতা আসে ভিজে। ভাবে, এ যদি রাশিয়ান কোনো মেয়ে না হয়ে আমার বোন হতো! তাহলে আমি কী করতাম? কিন্তু আবেগে ভেসে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল না তাঁর। তাই সহজেই তাঁকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে না খালেদ। ভাবে, সে যদি কোনো প্রতারক হয়! একটু নীরব থেকে মা ও বোনদের সঙ্গে পরামর্শ করে সে। মেয়েটি তখন খালেদের দিকে মিনতিভরা চোখে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। আর চোখ থেকে ঝরতে থাকে শুধু অশ্রু আর অশ্রু। এ অবস্থা দেখে বাসায় নিয়ে যাওয়ার পক্ষেই মত দেয় সবাই। এবং তাঁকেসহ সবাই রওনা হয়ে যায় বাসার দিকে।

একটু আগের মিনতিভরা চোখে এখন কৃতজ্ঞতার ছায়া নেমে আসে। আশ্রয় পাওয়া মানুষের কৃতজ্ঞ চাহনি, যা সতীত্ব রক্ষার মহিমায় ভাস্বর। বাসায় এসে তরুণী রাশিয়ায় নিজের পরিবারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। একবার, দুবার, বারবার। কিন্তু পাওয়া যায় না কোনো সাড়া। হয়তো টেলিফোন খারাপ, না হয় টেলিফোনের কাছে কেউ নেই। তারপরও সে অব্যাহত রাখে চেষ্টা।

এর-ই মধ্যে খালেদের পরিবার জানতে পারে, তরুণী খৃষ্টান। অবশ্য এতে ব্যবহারে কোনো ধরনের পার্থক্য হয় না; বরং ‘বিজাতীয় অতিথি’ হিসেবে ওর সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার হয়ে ওঠে আরও সৌজন্যমূলক। বোনেরা ওঁকে বানিয়ে নেয় নিজেদের গল্পসঙ্গিনী। তরুণীও সবাইকে গ্রহণ করে নেয় আপনজন করে। সবার নিবিড় সখ্যতায় মুগ্ধ হয়ে পড়ে সে। পরের বাড়িকেই মনে করতে থাকে নিজের বাড়ি।

মুসলমানদের কাজ মানুষদের ইসলামের দিকে আহ্বান করা। খালেদের পরিবারও তরুণীকে ইসলামের দিকে ডাকে। কিন্তু সাড়া দেয় না সে। ধর্ম নিয়ে কোনো বিতর্কেও জড়াতে চায় না সে।

কেননা, সে ছিল মনেপ্রাণে কট্টরপন্থী এক খৃষ্টান। ধর্ম পরিবর্তন করা তাঁর জন্য কঠিন। তবে খালেদের পরিবারও হাল ছাড়তে রাজি নয়। খালেদ ছুটে যায় স্থানীয় এক ইসলামি দাওয়া সংস্থার অফিসে। সেখান থেকে নিয়ে আসে রুশ ভাষায় লিখিত ইসলাম সম্পর্কীয় কিছু গ্রন্থ। সেসব গ্রন্থ পড়তে দেয় তরুণীকে। এবার আর না বলতে পারে না সে। বরং শুরু করে পড়া। পড়তে পড়তে দেখে, খারাপ লাগছে না তো! ধীরে ধীরে ইসলামের প্রতি তার কৌতূহল বাড়তে থাকে। আর প্রভাবিত হতে থাকে।

এভাবে গড়াতে থাকে সময়। সঙ্গে চলতে থাকে পরিবারের পক্ষ থেকে চেষ্টা, সাধনা, কৌশল ও দোয়া। অবশেষে তরুণীর মন যায় গলে। 'ইসলাম' কবুল করে হয় ধন্য! ইসলাম-ই এখন তাঁর ভালোবাসা। ইসলাম-ই এখন তাঁর অনুরাগ। ইসলাম-ই এখন তাঁর ধ্যানজ্ঞান। আমুল বদলে যায় তাঁর জীবন।

এখন সে দীন শেখায় হয়ে ওঠে একজন নিবেদিত প্রাণ। পুণ্যবতী নারী-সংশ্রব তাঁর কাছে এখন লোভনীয়।

দেশে ফিরে যেতে এখন আর মন চায় না তাঁর। দেশে গেলে মা-বাবা জোর করে ওঁকে খৃষ্টধর্মে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালাতে পারে আবার। কে চায় আলো থেকে আঁধারে যেতে? কিন্তু এ অবস্থায় আরেকজনের গৃহেইবা থাকা যায় কয়দিন? তাঁর চেহারায় ফুটে ওঠে দুশ্চিন্তার বিষাদময় রেখা। এ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো পথ কি তাঁর সামনে আছে খোলা? না, সে জানে না। কিছুই জানে না সে।

বিবাহ

অবশেষে তাঁর সামনে সবচেয়ে প্রশস্ত পথটি খুলে যায়। আর সেই পথে-ই ঘুরতে থাকে এখন তাঁর জীবনের চাকা। কিছুদিন পর বিবাহ হয়ে যায় তাঁর খালেদের সঙ্গে। অবসান হয় সকল দুশ্চিন্তার। এমন স্ত্রী পেয়ে খালেদ যেমন খুশি, তেমনি হাবুডুবু খাওয়া দরিয়ার তীর খুঁজে পাওয়ার আনন্দে তরুণীও বেশ খুশি। জীবনের অঙ্ক এত চমৎকারভাবে সাধারণত কখনো মিলে না। তবে মিলে তখনই যখন থাকে কুদরতের ইশারা! এখানেও ছিল আসমানি সেই ইশারা! সতীত্ব ও সম্মানকে যারা সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে বদ্ধপরিকর, কুদরতের সহযোগিতাও হয় নিত্যসঙ্গী তাঁদের। না হয়, যে রাশিয়ান তরুণীর হওয়ার কথা ছিল অন্যের শয্যাসঙ্গিনী, কেন হবে সে একজন ইসলাম প্রচারিনী?

এই হিজাব-ই প্রকৃত হিজাব

তরুণী স্বামী খালেদের সঙ্গে যায় এক বিপণিবিতানে। সেখানে সে দেখে এক হিজাবপরা মহিলাকে, যার চেহারা সম্পূর্ণ আবৃত ছিল। এ প্রথম সে কোনো এক পূর্ণ হিজাবপরা মহিলাকে দেখে। তাই হিজাবের অচেনা আকৃতি দেখে ভীষণ অবাক হয় সে।

বলে, খালেদ! এ ভদ্র মহিলা এমন করে পুরো মুখ ঢেকে রেখেছে কেন? তাঁর চেহারা কি এসিড দগ্ধ ? যা প্রকাশ করতে লজ্জা পাচ্ছে সে?

খালেদ বলে, না না, ইনিই পরেছেন আসল হিজাব। এ হিজাব-ই প্রকৃত

হিজাব। এমন হিজাবেরই নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে তরুণী বলে, ও হ্যাঁ, আমার কাছে আগে এত স্পষ্ট ছিল না ব্যাপারটা। মূলত এটাই ইসলামি হিজাব হওয়া উচিত। এমন হিজাব-ই চান আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে।

খালেদ বলে, তুমি বুঝলে কি করে?

শোনো! আমি এখানে আসার পর যে মার্কেটেই গিয়েছি, দেখতে পেয়েছি; একদল মানুষ হাঁ করে আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে। অবনত দৃষ্টি হয়-ই না। যেন ওরা গোগ্রাসে খেয়ে ফেলবে আমার চেহারাকে। এতে আমি বুঝতে পেরেছি আমার চেহারা সম্পূর্ণরূপে ঢেকে রাখতে হবে। স্বামী ও নিকটাত্মীয় ছাড়া আর কেউ আমার মুখাবয়ব দেখতে পারবে না। আজ থেকে আমি পূর্ণ ইসলামি হিজাব না পরে আর কোনো মার্কেটে যাবো না। বাইরেও বের হবো না। বলো, কোথায় পাওয়া যাবে এই হিজাব?

খালেদ বলে, আমার মা-বোনদের মতো মুখ খোলা হিজাব-ই তুমি আপাতত পরো!

তরুণী বলে, না না, তা হয় না। আমি এখন মুসলমান। পূর্ণ মুসলমান। তাহলে আমার হিজাব কেন হবে, অপূর্ণ? ওই হিজাবই পরতে চাই আমি, যা পছন্দ করেন আল্লাহ ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এভাবেই গড়িয়ে যায় সময়। তরুণীর ইমান-আমলও বাড়তে থাকে দিন দিন। খালেদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি দয়া ও দরদের এবং প্রেম ও ভালোবাসার ছিল না কোনো কমতি।

স্ত্রীও খালেদের মনের গভীরে ঠিকানা করে নেয়। আনুগত্য ও ভালোবাসার পাপড়ি ছড়িয়ে ছড়িয়ে। স্বামীর সরব ও নীরব অনুভূতির সঙ্গে কথা বলে বলে। খালেদের পরিবার ভীষণ খুশি। তারা ভাবে, সেদিন রাস্তায় আমরা রাশিয়ান কোনো এক তরুণী আবিষ্কার করেছিলাম, নাকি পেয়েছিলাম জীবন্ত কোনো এক হীরকখণ্ড?

বেশ কিছুদিন পরের কথা। তরুণী নিজের 'পাসপোর্ট' বের করে দেখে, মেয়াদ প্রায় শেষের দিকে। অতিসত্তর নতুন 'পাসপোর্ট' তৈরি করতে হবে। এবং রাশিয়ায় গিয়ে নিজের জেলা শহর থেকে তা করে আনতে হবে। অতএব রাশিয়ায় যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই তাঁর সামনে। অন্যথা এখানে বসবাস হয়ে যাবে অবৈধ তাঁর। স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করে। খালেদও সিদ্ধান্ত নেয় তাঁর সঙ্গে যাওয়ার। কারণ, মহিলাদের মাহরাম ব্যতীত একাকী সফর করার বা দূরে কোথাও যাওয়ার 'ইসলামি শরিয়ত' অনুমোদন দেয় না।

রাশিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমানে রাশিয়ার উদ্দেশে উভয়ে রওনা হয়ে যায়। পূর্ণ ইসলামি হিজাবে আবৃত হয়ে-ই বিমানে ওঠে তরুণী। বসে আছে স্বামীর পাশে বুকভরা এক গর্ব নিয়ে। আর পর্দা তো এখন তাঁর কাছে গর্বেরই এক বিষয়!

খালেদ স্ত্রীর পাশে গিয়ে বলে,

তোমার পর্দার কারণে এখানে সমস্যায় পড়তে পারি আমরা।

এরপর স্ত্রী বলে, তবে কি তুমি চাও আমি আল্লাহর বিধানকে অমান্য করি? না, আমি কিন্তু কখনো আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করতে পারব না। আমি কারও ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা করি না।

সত্য হয় খালেদের শঙ্কাই। বিমান আরোহীরা বাঁকা চোখে ওর স্ত্রীর দিকে তাকাতে থাকে। বিমানবালা খাবার পরিবেশন করে। খাবারের সঙ্গে দেয় মদ। মদ খেয়ে মদ্যপরা শুরু করে মাতলামি। এদিক-ওদিক থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে করতে থাকে বিভিন্ন কটুক্তি। কেউ তিরস্কার করে। কেউ মুখ টিপে হাসে। কেউ ঠাট্টা-বিদ্রূপে মেতে ওঠে। কেউ তাঁর পাশে ঢুলতে ঢুলতে এসে দাঁড়ায়।

কিন্তু খালেদ কিছুই বুঝতে পারছে না, কী করবে সে! কারণ, সব কিছুই বলা হচ্ছে রুশ ভাষায়। সে মনে মনে ক্ষুব্ধ হচ্ছে, ফুঁসে উঠছে। অথচ তাঁর স্ত্রী মৃদুভঙ্গিতে হাসছে। ওদের কিছু কিছু কথা তরুণী খালেদকে অনুবাদ করে শোনায়। অনুবাদ শুনে খালেদের শরীর আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কিন্তু স্ত্রী তাঁকে শান্ত থাকতে বলে। আরও বলে, সাহাবায়েকেরাম দীনের জন্য যে কষ্ট সহ্য করেছেন এবং যে নিপীড়ন সয়েছেন, সেই তুলনায় আমরা কী করছি বা কী সইছি?

এরপর উভয়ে ধৈর্য ধরে। এবং ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। একসময় বিমান আপন গন্তব্যে পৌঁছে যায়।

রাশিয়ায়

এর পরের ঘটনা শুনি আমরা খাদের মুখে, বিমানবন্দরে নামার পর ধারণা ছিল তাঁর মা-বাবার কাছেই যাব আমরা এবং সেখানেই অবস্থান করব। এর মাঝে 'পাসপোর্ট' নবায়নের যাবতীয় কাজ সেরে আবার

আপন ঠিকানায় ফিরে আসব। কিন্তু আমার স্ত্রী ভিন্ন কিছু ভাবে। সে আমাকে বলে, আমার পরিবার কট্টরপন্থী খৃষ্টান। তাই সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না। আমরা বরং একটা ভাড়া বাসা নিই। সেখান থেকেই আমাদের যাবতীয় কাজ সেরে নিব। ফিরে যাওয়ার পূর্বে তাঁদের খোঁজখবর জেনে যাব।

আমি দেখি তাঁর পরামর্শ-ই যুক্তিযুক্ত। তাই আমরা ছোট্ট একটি বাসা ভাড়া নিই। এবং সেখানে উঠি।

পরদিন যাই 'পাসপোর্ট' অফিসে। অফিসারের নিকট আমাদের সব বিষয় খুলে বলি। তিনি আমাদের বলেন, পুরোনো 'পাসপোর্ট' দিতে ও সদ্যতোলা রঙিন এককপি ছবি দিতে। আমি তখন আমার স্ত্রীর কয়েকটি সাদাকালো ছবি অফিসারের সামনে বের করে দিই। সর্বাঙ্গ হিজাবে ঢাকা, শুধু চেহারা ব্যতীত। অফিসার বলে, না। এ ছবি চলবে না। রঙিন ছবি দিতে হবে। সেই ছবিতে চেহারা, চুল ও কাঁধ খোলা থাকতে হবে।

কিন্তু আমার স্ত্রী সাদাকালো ছবি ছাড়া অন্য কোনো ছবি দিতে রাজি হয় না।

তাই প্রথম অফিসারের কাছে আমরা হই ব্যর্থ। তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অফিসারের কাছে যাই। কিন্তু কাজ হয় না কোনো অফিসারের নিকটেই। সবাই অনাবৃত রঙিন ছবি চায়। এ অবস্থায় আমার স্ত্রী বলে, আমি কোনো অবস্থাতেই অনাবৃত রঙিন ছবি দিতে পারব না।

তখন অফিসার বলে, তাহলে 'পাসপোর্ট'ও নবায়ন করতে পারবেন না আপনি।

এরপর আমরা শরণাপন্ন হই বিভাগীয় প্রধানের কাছে। তিনি ছিলেন একজন মহিলা অফিসার । আমার স্ত্রী তাঁকে অনুরোধ করে, এ ছবিই গ্রহণ করতে। কিন্তু তিনিও না করে দেন। তবে আমার স্ত্রী হাল ছাড়তে রাজি নয়।

বরং তাঁকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করে। বলে, আপনি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না? যে ছবি আপনাকে দিলাম, তার সঙ্গে আমাকে একটু ভালো করে মিলিয়ে নেন না, চেহারাই তো আসল। চুল একসময় বদলে যায়, চেহারা তো আর দ্রুত বদলায় না। আমি মনে করি, এ ছবিই তো যথেষ্ট। অনাবৃত রঙিন ছবির কোনো প্রয়োজন নেই।

পরিচালক তবু না-ই করে দিলেন। বললেন,

প্রশাসন এটা অনুমোদন করবে না। আমাদের কিছুই করার নেই।

আমার স্ত্রী বলে, আমি এ ছবি ছাড়া অন্য ছবি দিতে পারব না। এবার বলুন, এর সমাধান কী?

পরিচালক বলেন, আমার নিকট এ সমস্যার কোনো সমাধান নেই। এর সমাধান দিতে পারবে একমাত্র মস্কোর প্রধান 'পাসপোর্ট অফিসে'র মহাপরিচালক। সেখানে গিয়ে আপনি চেষ্টা করতে পারেন।

এরপর আমরা 'পাসপোর্ট অফিস' থেকে বেরিয়ে আসি। আমার স্ত্রী আমার দিকে তাকিয়ে বলে, খালেদ! চলো আমাদের মস্কো যেতে হবে! আমি বলি, মস্কো যাওয়ার দরকার নেই, তুমি বরং হিজাববিহীন রঙিন ছবি তুলেই ওদের দিয়ে দাও। মানুষকে নিজের ওপর সাধ্যাতীত কিছু চাপিয়ে নিতে নিষেধ করেছেন আল্লাহ। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো! যতটুকু পারো সাধ্যের মধ্যে থেকে করো। এটা তো একটা প্রয়োজন। তা ছাড়া তোমার 'পাসপোর্ট' তো আর সবাই দেখবে না; নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি ছাড়া। তাও দেখবে আবার প্রয়োজনের খাতিরে। তারপর তুমি নিজের 'পাসপোর্ট' রেখে দিও নিজের কাছেই। মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ আর তা দেখতে চাইবে না তোমার কাছে। অতএব তুমি ব্যাপারটা সহজভাবে নাও, তাহলে আর মস্কো যাওয়া লাগবে না।

কিন্তু সে নিজের সিদ্ধান্তে থাকে অনড়।

না! হিজাবহীন ছবি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, এখন আমি দীন বুঝি!

পর্দার মাহাত্ম্য বুঝি! পর্দা আল্লাহর হুকুম! একদল বেইমানের কারণে আমি আমার রব-এর হুকুম অমান্য করতে পারি না। আর করবও না কখনো-ই। ফলাফল যা হয় হোক।

মস্কোতে

স্ত্রী তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। সে মস্কো যাবেই। তাই আমিও রাজি হয়ে যাই। প্রথম অভিযানে ব্যর্থ হওয়ার পর আমার মন খুব খারাপ হয়ে যায়। জানি না, দ্বিতীয় অভিযান আরও শক্ত ও কঠিন হয় কি না। মস্কো পৌঁছে প্রথমে একটা ঘর ভাড়া নিই। সেখানেই রাত কাটাই।

পরদিন হাজির হই মস্কো 'পাসপোর্ট' অফিসে। কিন্তু এখানেও আগের মতোই অবস্থা। প্রথম যে অফিসারের কাছে যাই। তিনি বলে দেন, না। না করে দেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় অফিসারও। সবশেষ না শুনতে শুনতে বাধ্য হই বড় অফিসারের কাছে যেতে। কিন্তু বড় অফিসারের রূপ আরও রুদ্র। তিনি 'পাসপোর্ট' হাতে নিয়ে আগের ছবিটা উল্টেপাল্টে বলেন, কী প্রমাণ আছে যে, আপনি-ই এ ছবির বাহক?

সে আমার স্ত্রীকে রূঢ়ভঙ্গিতে পর্দা সরাতে বলে। এবং চেহারা দেখতে চায়। আমার স্ত্রী উত্তর দেয়, আমি কোনো পরপুরুষের সামনে আমার চেহারা খুলি না। তবে এখানে কোনো মহিলা অফিসার কিংবা কোনো মহিলা সেক্রেটারি যদি থেকে থাকে, তাহলে সে আমার চেহারা এ ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারে।

বড় অফিসার এ কথায় হনহন করে ওঠে। আর পুরোনো পাসপোর্ট, ছবি ও অন্যান্য কাগজপত্র এক সঙ্গে জমা করে তার বিশেষ ড্রয়ারে রেখে তালা মেরে দেয়। আর বলে, আমাদের শর্ত মোতাবেক ছবি না দিলে পুরোনো পাসপোর্টও আপনি পাবেন না। বুঝলেন?

আমার স্ত্রী তাঁকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করে, কিন্তু সে কোনোভাবেই বুঝতে চেষ্টা করে না। তারা উভয়ে কথা বলে, রাশিয়ান ভাষায়। যে ভাষাজ্ঞান আমার নেই। সুতরাং আমার নীরবে শুধু দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। তবে আমার শরীর বারবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মনে মনে বলি, রুশরা কী অসভ্য! এটা কি আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, নাকি ইসলাম বিদ্বেষ?

আমার স্ত্রী বোঝানোর অনেক চেষ্টা করে; কিন্তু সে কোনো ভাবেই বুঝতে চায় না। কোনো যুক্তিও শুনতে চায় না। বরাবরই বলে, আমাদের শর্ত অনুযায়ী-ই আপনাকে ছবি দিতে হবে।

আমি বিরক্ত হয়ে স্ত্রীকে বলি, দেখো, তুমি এখানে অসহায়। কিছু-ই করার নেই তোমার। পর্দা রক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করেছ তুমি! কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। এমনকি তুমি তোমার সাধ্যাতীত চেষ্টাও করেছ! আল্লাহ এখন ক্ষমা করে দেবেন তোমাকে। ওদের শর্ত মেনে নাও। নইলে আর কত জায়গায় আমরা ছুটোছুটি করব? অফিসারদের দ্বারে দ্বারে আর কত ঘুরব?

স্ত্রী তখন আমাকে বলে,

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ﴿۲﴾ وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،

যে আল্লাহকে ভয় করে, তার জন্য আল্লাহ মুক্তির পথ বের করে দেন। এবং তাঁকে রিজিক দান করেন এমন জায়গা থেকে, যা সে কখনো কল্পনাও করেনি।

[সুরা তালাক : ২]

এভাবে আমার ও তার মাঝে কথা কাটাকাটি হতে থাকে। মাঝে মাঝে চলে বিতর্কও। এতে বড় অফিসার রাগ করে আমাদের অফিস থেকে বের করে দেন।

আমরা বের হয়ে যাই অফিস থেকে। এদিকে আমার স্ত্রীর প্রতি আমার দয়াও হচ্ছে; আবার ক্ষোভও হচ্ছে। বাসায় এসে আমরা বিষয়টা পর্যালোচনা করি। আমার স্ত্রী নিজের মতের পক্ষে যুক্তি পেশ করে। আমি আমার মতের পক্ষে যুক্তি পেশ করি। ও চায় আমাকে বোঝাতে, আমি চাই ওকে বোঝাতে। এভাবেই নেমে আসে রাত। দুজনে মিলে এশার সালাত আদায় করি।

আমার মন ভীষণ ভার হয়ে আছে। সালাত আদায়ের পর কোনো রকম রাতের খাবার খেয়ে ঘুমাতে চলে যাই আমি। কিন্তু ঘুম কি আর আসে?

আমাকে এমন নিস্তেজ অবস্থায় দেখে আমার স্ত্রী.. চেহারা হয়ে যায় বিবর্ণ। আমার দিকে সে তাকিয়ে বলে,

খালেদ! ঘুমাচ্ছ তুমি?

আমি বলি,

হ্যাঁ, ঘুমাচ্ছি। তুমি কি কোনো ক্লান্তি অনুভব করছ না? ঘুমাবে না তুমি?
সে অবাক হয়ে বলে,

হায় আল্লাহ! এ পরিস্থিতিতে কি করে ঘুম আসে তোমার? এখন ঘুমানোর সময় না খালেদ! আল্লাহর কাছে আশ্রয় ও সাহায্য চাওয়ার সময়। ওঠো, আল্লাহর সাহায্য চাও। দোয়া করো।

আমার স্ত্রীর কণ্ঠে কী ছিল জানি না আমি। আমি কিন্তু আর শুয়ে থাকতে পারিনি। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে যাই সালাতে। দীর্ঘক্ষণ সালাত আদায় করি। দোয়া করি। আল্লাহর সাহায্য চাই। এরপর আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। আবার শুয়ে পড়ি। কিন্তু আমার স্ত্রী! সে ঘুমায় না একটুও। ইবাদত আর দোয়ায়
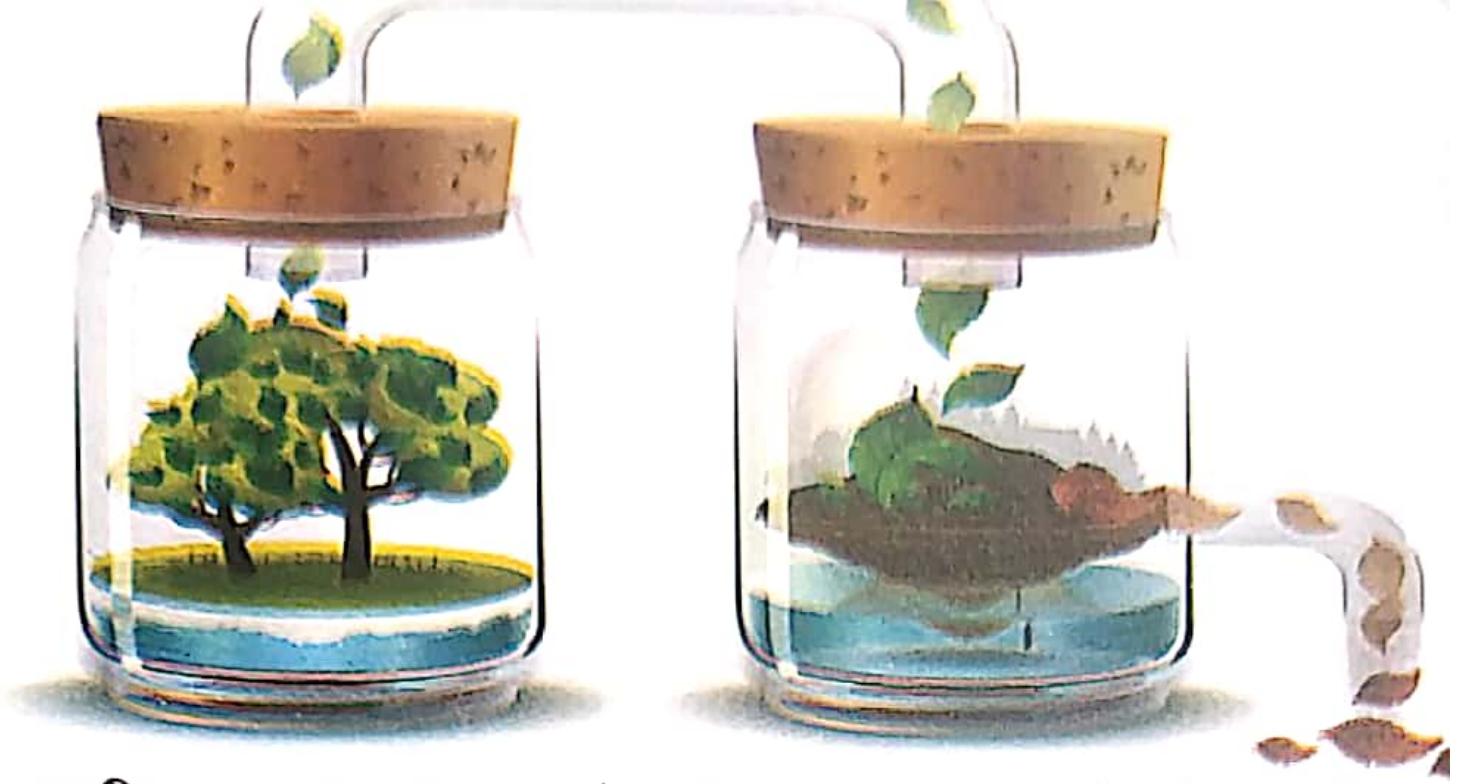
কাটিয়ে দেয় সারারাত। যখনই আমার ঘুম ভাঙ্গে, তখনই তাঁকে দেখি, সেজদায় কিংবা রুকুতে। কখনো দাঁড়ানো, কখনো মুনাজাতে। ফজর পর্যন্ত!

ফজরের সময় আমাকে ঘুম থেকে জাগায়। বলে,

ওঠো, ফজরের সালাতের সময় হয়েছে।

আমি উঠে ওজু করি। ফজরের সালাত আদায় করি। ফজরের পর সে একটু ঘুমায়। সূর্যালোক ছড়িয়ে পড়তে-ই আবার উঠে যায়। বলে,

চলো, আমাদের তাড়াতাড়ি 'পাসপোর্ট' অফিসে যেতে হবে।

আমি বলি,

কী! পাসপোর্ট অফিসে! কী নিয়ে যাবো? পুরোনো পাসপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র সব তো বড় অফিসার রেখে দিয়েছেন! এখন কোন যুক্তিতে আবার তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো? নতুন ছবি কোথায়? এখন তো কোনো ছবি-ই আমাদের কাছে নেই!

সে তখন বেশ আস্থার সঙ্গে বলে,

চলো, আমরা যাবো। চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া-ই হলো আমাদের কাজ। মঞ্জুর করার কাজ তো আল্লাহ তাআলার। তাঁর রহমত ও দয়া থেকে

নিরাশ হয়ো না।

শেষমেশ আমরা আবার যাই।

অফিসে ঢুকতেই আমার স্ত্রীর পরিচিত আকার-আকৃতি দেখে এক অফিসার বলে ওঠে,

অমুক মহিলা কোথায়?

আমার স্ত্রী বলে,

অমুক মহিলা তো আমিই! আপনার সামনেই তো আমি!

লোকটি বলে,

নিন আপনার 'পাসপোর্ট'!

হাতে নিয়ে দেখি, নতুন এবং সদ্যপূরণ করা সব!

শুরুতেই দেখি, শোভা পাচ্ছে তাঁর হিজাবময় ছবি!

স্ত্রী আমার ভীষণ খুশি। আমার দিকে তাকিয়ে বলে,

আমি কি তোমাকে বলিনি?

আল্লাহকে যে ভয় করে, আল্লাহ তাঁর জন্য মুক্তির পথ বের করে দেন! আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। তখন অফিসার আমাদের বলেন,

আপনারা এবার ফিরে যেতে পারেন, সেই শহরে; যে শহর থেকে আপনারা এসেছেন। সেখানে গিয়ে স্থানীয় অফিস থেকে বাকি সিলগুলো লাগিয়ে নিলেই হবে।

আমরা যেই শহর থেকে আমাদের যাত্রা শুরু করেছি সেই শহরে ফিরে আসি। যেখানে আমার স্ত্রীর পরিবার বসবাস করে। আমি মনে মনে ভাবি, কাজ শেষ করে সাক্ষাৎ করতে যাবো ওর পরিবারের সঙ্গে। আমরা আবার ছোট্ট একটি ঘর ভাড়া করে উঠি সেখানে। পরদিন স্থানীয় অফিস

থেকে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করি।

আলহামদুলিল্লাহ! এবার আর কোনো সমস্যা হয়নি। সবাই বেশ সমীহ করে আমাদের দিকে তাকায়। মস্কো অফিস জয় করে আসা বীরদের পাওনা তো এমনই হবে!

স্নেহের বাগানে নিষ্ঠুরতার ফুল!

আমার স্ত্রীর পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই আমরা। দরজায় আওয়াজ দিই। বেশ পুরোনো এক বাড়ি। জীর্ণশীর্ণ অবস্থা বলে দিচ্ছে এ বাড়ির অধীবাসীরা হতদরিদ্র।

ওর বড় ভাই দরজা খুলে। হাড্ডিসার এক যুবক। স্ত্রী তাঁর ভাইকে দেখে খুশিতে আটখান। নেকাব খুলে দীর্ঘদিন পর মিলন হওয়াতে জড়িয়ে ধরে খুব হাসে। উষ্ণতা ছড়িয়ে কুশল বিনিময় করে ।

নিরাপদে বোনের ফিরে আসায় যেমন ভাই আনন্দিত, আবার কৃষ্ণকাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা থাকায় ঠিক ততটাই বিস্মিত।

আমিও ওর পেছন পেছন ভেতর প্রবেশ করি। বৈঠকখানায় বসি। একাই বসি। আর সে চলে যায় অন্দরমহলে। ভেতরে গিয়ে সে রুশভাষায় কথা বলা শুরু করে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু অনুমান করতে পারছি যে, ভেতরের পরিবেশ ধীরে ধীরে ধুমায়িত হয়ে উঠছে। ভেসে আসছে আমার কানে ধারালো কথারবাণ। হৈ চৈ, চিৎকার। সবাই ওঁকে ঘিরে ক্ষোভ প্রকাশ করছে। আর সে সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করছে।

আমি তাঁর প্রতি নিপীড়ন হওয়ার আশঙ্কা করি। কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি না, ভাষাজ্ঞানের

অভাবে। ব্যর্থ হই পরিস্থিতির নাজুকতা আঁচ করতেও ।

হঠাৎ চিৎকার-চেঁচামেচি আমার কানে ভেসে আসে। ধীরে ধীরে আওয়াজ আমার দিকে আসতে থাকে। একপর্যায় আমার একেবারে মুখের ওপর এসে যায়! দেখি, এক অতিশয় বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে তিন যুবকসহ আমার দিকে তেড়ে আসে। প্রমোদ ভেবে আমি বসে থাকি। প্রথমে ভাবি, বৃদ্ধ মনে হয় আসছে জামাতাকে স্বাগত জানাতে। তবে মিষ্টান্ন নিয়ে নয়, বরং কিলঘুষি নিয়ে! একটু পরই আমার ওপর উজাড় করে দেয় তারা কিলঘুষি। তাতেই আমার জামাইবরণ চিন্তা বদলে যায়।

আমি আরবের রক্তমাংসের সন্তান। তাই চেষ্টা করি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। কিন্তু আমার আপদমস্তক ষোলটি হাত-পায়ের নিষ্ঠুর সঞ্চালন কাবু করে ফেলে। আমি চিৎকার করে সাহায্য চাই। অনুভব করি আমার শক্তি শেষ হয়ে আসছে। আরও অনুভব করি, হয়তো এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে আমাকে। ওদের কিল-ঘুষি-লাথি ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। জীবন বাঁচানোর আকুতি নিয়ে আমি কেবল দরজা খুঁজতে থাকি। চেষ্টা তো করতেই হবে, যদি জান বাঁচানো যায় পালিয়ে!

হঠাৎ দরজা নজরে পড়ে। তখনই দরজা দিয়ে দিই দৌড়। শরীরের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে দ্রুত দরজা ফাঁক করে পালাই। ওরাও ধাওয়া করে আমার পেছন পেছন। কিন্তু দ্রুত আমি ঢুকে পড়ি লোকসমাগমের ভেতর। এবং চলে যাই তাঁদের দৃষ্টির আড়ালে।

তারপর কোনোরকম ঘরে এসে শরীর এলিয়ে দিই বিছানায়। ভাগ্যিস!

ঘরটা বেশি দূরে ছিল না। কিছুক্ষণ পর গোসলখানায় ঢুকে নাকে-মুখে লেগে থাকা রক্ত ধুয়ে নিই। নিজের দিকে তাকাই। আঁতকে উঠি। কিলঘুষি আর লাথির আঘাতে নাকে-মুখে ও সারা শরীরে ছড়িয়ে আছে ছোপ ছোপ রক্ত। মুখ থেকেও বের হচ্ছে রক্ত। নাক থেকেও বের হচ্ছে রক্ত। ছড়িয়ে পড়ছে বেয়ে বেয়ে আমার বিধ্বস্ত দেহে। ছিন্নভিন্ন পাঞ্জাবিতে। মনে হচ্ছে যেন আমি যুদ্ধফেরত এক আহত সৈনিক। তবুও হাজার শোকর আল্লাহর।

তিনি আমাকে জানে বাঁচিয়ে দিয়েছেন; এই নরপশুদের হাত থেকে।

কিছুক্ষণ পরেই মনটা ভার হয়ে যায়। আমি তো বেঁচে গেলাম! কিন্তু আমার স্ত্রীর অবস্থা কী? ওরা যদি তাঁকে মেরে ফেলে?

আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকে ওর হিজাবে ঢাকা ছবি। সেও কি আমার মতো এমন নির্দয়, নিষ্ঠুর প্রহারের মুখোমুখি হয়েছে? আমি তো পুরুষ। ধৈর্য দিয়ে, শক্তি দিয়ে এবং উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে পরিস্থিতি সামলে উঠেছি। সে তো এক অবলা নারী! পারবে কি সইতে এই অত্যাচার! আমার বড্ড আশঙ্কা হচ্ছে, মনে হয় আমার স্ত্রী ভেঙ্গে পড়বে!

তাহলে কি বিচ্ছেদের সময় ঘনিয়ে এসেছে?

শয়তানের কাজ শয়তানি করা। শয়তানি শুরু হয়ে গেছে। শয়তান আমার মনে নানা দুশ্চিন্তা ঢুকিয়ে দিতে থাকে। তোমার স্ত্রীর আশা বাদ দাও। সে ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে! সে ফিরে গেছে খৃষ্টধর্মে! তোমাকে দেশে ফিরতে হবে একা।

আমার চিত্ত বড় অস্থির হয়ে ওঠে! অচেনা এক দেশ! কোথায় যাবো! কার কাছে যাবো! কী করবো! পত্রিকায় পড়েছি এদেশে নাকি জীবনের মূল্য নেই কোনো। কাউকে খুন করতে হলে এখানে দশ ডলারে-ই পাওয়া যায় ভাড়াটে খুনি!

ওহ! কী হবে আমার অবস্থা? যদি আমার স্ত্রী অত্যাচারের মুখে ঈমান ছেড়ে বেঈমান হয়ে যায়! এবং

আমার বর্তমান অবস্থানও দেয় বলে! ওই পাষণ্ডদের? তখন ওরা যদি ভাড়াটে খুনি পাঠিয়ে আমাকে.....? না। আর ভাবতে পারছি না।

আমার রাত কাটে ভীষণ দুর্ভাবনায়। ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়। কোনোভাবেই চোখের পাতা এক করতে পারছি না।

সকালে ছদ্মবেশ ধরি। দূর থেকে আমার স্ত্রীর খবরাখবর জানার জন্য গোয়েন্দাগিরি শুরু করি। শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। বের হতে মন চায় না। কিন্তু কর্তব্য কাজ না করে কাপুরুষতার অপবাদ মাথায় বয়ে বেড়াব! তেমন পুরুষ তো আমি নই। তাই ব্যথায়কাতর দেহটা টেনে টেনে ওদের বাড়ির নিকটে গিয়ে সুবিধাজনক এক জায়গায় অবস্থান নিই। সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে ওদের বাড়ি পরিষ্কারভাবে। বাড়ির দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকি। সবকিছু নিরীক্ষণ করি। বাড়ির ফটক আটকানো। আমি সেখানেই বসে থাকি, উত্তেজনাপূর্ণ প্রহর কাটাতে কাটাতে। হঠাৎ দেখি, ফটক খুলে একজন প্রৌঢ় বের হচ্ছে। সঙ্গে সেই তিন যুবক, যারা সবাই মিলে আমাকে পিটিয়েছিল। মনে হচ্ছে এরা কাজে যাচ্ছে।

আবার ফটক বন্ধ হয়ে যায়। বড় একটা তালাও দেওয়া হয় ঝুলিয়ে। আমি ওত পেতে বসে থাকি। আমার স্ত্রীর মুখ দেখার জন্য আমি অপলকদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু এতে লাভ হয় না কোনো।

এ অবস্থায় আমার কেটে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। হঠাৎ দেখি, আমার শ্বশুর তিন জোয়ানসহ ফিরে আসে। আমি ভীষণ ক্লান্তি অনুভব করি। পাহাড়সম দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে আবার ফিরে আসি বাসায়।

পরদিন আবার সেখানে গিয়ে সতর্কাবস্থায় বসে থাকি। অপেক্ষায় অপেক্ষায় আর পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষণে কেটে যায় সারা বেলা। আবার ফিরে যাই ঘরে। দ্বিতীয় দিনের ব্যর্থতায় রাজ্যের

দুশ্চিন্তা আমাকে ঘিরে ধরে।

তৃতীয় দিন। না। কোনো লাভ হয় না আজও। স্ত্রীর পাই না কোনো খবর। ধীরে ধীরে আমি ভেঙ্গে পড়ি। হতাশা আমাকে চেপে ধরে। বারবার আমার মনকে তছনছ করে দিচ্ছে এ শঙ্কা, ওরা হয়তো আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে মেরে ফেলেছে! শাস্তির তাণ্ডবে হয়তো মৃত্যুই হয়ে গেছে ওর!

সঙ্গে সঙ্গেই আবার মন থেকে এ আশঙ্কা দূরে ঠেলে দিই। ভাবি, যদি সে মরে যেত, তাহলে নিদেনপক্ষে ঘরের লোকজনের আনাগোনাও বেড়ে যেত। সৃষ্টি হতো একটা অস্বাভাবিক পরিবেশ। কিন্তু চোখে তো পড়ছে না এমন কোনো অবস্থা! এসব ভেবে ভেবে মনকে প্রবোধ দিই।

বলি, অপেক্ষা করো মন! সে নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। শিঘ্রই তুমি দেখা পাবে তাঁর।

হ্যাঁ, মিলন ঘটে অবশেষে!

চতুর্থ দিন। আমি বসে থাকতে পারি না ঘরে। ছুটে যাই তাঁর বাড়ির কাছে। পূর্বের মতো দেখি বাপ-বেটারা কাজে যাচ্ছে। আমি তাকিয়ে থাকি শুধু জীর্ণশীর্ণ বাড়িটার দিকে।

হঠাৎ দেখি ফটক খুলে গেছে। আরও দেখি, ফটকের মুখ দিয়ে আমার স্ত্রীকে দেখা যাচ্ছে। সে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। আমি গভীরভাবে তাঁর দিকে তাকাই। হাহাকার করে ওঠে আমার মন। দেখি, আমার চেয়ে তাঁর অবস্থা আরও খারাপ। সীমাহীন কিলঘুষি ও কামড়ে তাঁর চেহারার অবস্থা বেহাল। চেহারায় ফুলে ওঠা লাল-নীল দাগগুলোই বলে দিচ্ছে নির্যাতনের কী ঝড় বয়ে গেছে তাঁর ওপর দিয়ে। তাঁর পরনের কাপড়

হয়ে আছে রক্তেলাল!

আমি তাঁর করুণ দশা দেখে আঁতকে উঠি। পারিপার্শ্বিকতাকে দূরে ঠেলে ছুটে যাই আরও নিকটে। তাঁকে দেখি আরও গভীরভাবে। মন হু হু করে কেঁদে ওঠে। ওর মুখের ক্ষতস্থান দিয়ে ঝরছে রক্ত। হাত-পা হয়ে আছে রক্তাক্ত। পরনের কাপড়টি ছিন্নভিন্ন। কোনোরকমে সতরটা ঢাকা। পা বাঁধা শেকলে। পেছন দিক থেকে হাতও বাঁধা। আমি আর সইতে পারি না। কেঁদে উঠি ঢুকরে। নাম ধরে দিই ডাক।

অবিচলতা ও অসিয়ত!

বেদনাশ্রু মুছতে মুছতে সে আমাকে বলে,

খালেদ! আমি সত্যের ওপর অটল আছি! আমার জন্য তুমি হয়ো না উদ্বিগ্ন। কসম আল্লার! যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি এখন যে জুলুমের মুখোমুখি, তা নবী-রসুল ও সাহাবি-তাবেইরা যে জুলুম সয়েছেন, তার বিপরীতে কিছুই না। সাবধান! তুমি ভুলেও আমার পরিবারের কারও মুখোমুখি হয়ো না। এক্ষুনি তুমি চলে যাও এখান থেকে। ঘরে বসেই অপেক্ষা করো আমার। আমি আসব ইনশাআল্লাহ! তুমি আমার জন্য দোয়া ও কান্নাকাটি বাড়িয়ে দাও। নফল সালাত আদায় করাও বাড়িয়ে দাও। বিপদ মুকাবিলায় নামাজ ও দোয়ার কোনো বিকল্প নেই।

আমি ফিরে যাই আমার ঘরে। বসে বসে অপেক্ষা করতে থাকি পুরো দিন। রাতও চলে যায়। কিন্তু সে আসে না।

এভাবে কেটে যায় আরও একদিন। সেদিনও সে আসে না। তৃতীয় দিনও শেষের পথে প্রায়। দিন শেষে নেমে আসে রাত। ধীরে ধীরে আরও গভীর হতে থাকে। আমার হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে যায়। হঠাৎ কে যেন দরজায় আওয়াজ দেয়। ভীত-সন্ত্রস্তচিত্তে ভাবতে থাকি! এত রাতে দরজায় কে? কে হতে পারে? আমার স্ত্রী নয় তো? নাকি ওর পরিবার আমার অবস্থান জেনে গেছে! এবং আমাকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছে ভাড়াটে খুনি? না, না, সম্ভবত আমারই স্ত্রী, সইতে না পেরে বলে দিয়েছে সব! মনে হয় ওরা এসেছে আমাকে হত্যা করতে এখন। মৃত্যুভয়ে আমি শুধু কাঁপতে থাকি। মৃত্যু ও আমার মধ্যকার ব্যবধান কি তাহলে একেবারেই চলে এসেছে কমে! তবুও ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াই। প্রবোধ দিতে থাকি মনকে। এ বলে যে, হায়াত-মওতের মালিক আল্লাহ। আমি এগিয়ে যাই। দরজায় কান পেতে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করি,

দরজায় কে? এত রাতে এসেছে কে?

তখন ভেসে আসে আমার স্ত্রীর কণ্ঠ! সে মৃদু আওয়াজে বলে,

খালেদ, দরজা খোলো। আমি এসেছি। ভয়ের কিছু নেই।

আমি আলো জ্বেলে দরজা খুলে দিই। আমার স্ত্রী বিধ্বস্ত অবস্থায় প্রবেশ করে ঘরে। সারা দেহ-ই ক্ষতবিক্ষত। ছোপ ছোপ রক্ত। আর কালবিলম্ব না করে সে বলে,

এক্ষুনি আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

আমি বলি,

তোমার তো অবস্থা খারাপ!

হ্যাঁ, কোনো উপায় নেই। জলদি! এখন

এখানে থাকা বিপজ্জনক!

পরিস্থিতির উপলব্ধি আমারও ছিল। তাই দ্বিমত না করে দ্রুত কাপড়চোপড় ব্যাগে ভরি। সে নিজেও তাঁর ব্যাগ গোঁছাতে থাকে। গায়ে থাকা পোশাক বদলে নেয়। হিজাবের ওপর পরে লম্বা একটা আবা। সবকিছু নিয়ে নিচে নেমে আসি আমরা। আল্লাহর মেহেরবানিতে সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাড়া গাড়িও পেয়ে যাই। আমার স্ত্রী ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে গাড়ির আসনে বসে।

বিমানবন্দরের পথে.....

গাড়িতে প্রথমে উঠি আমি। উঠেই চালককে রুশ ভাষায় বলি, যান। বিমানবন্দরে যান। কিছু কিছু রুশ শব্দ এতদিনে আমার আয়ত্ত হয়ে যায়। কিন্তু আমার স্ত্রী বলে,

না, এখন বিমানবন্দরে যাওয়া নিরাপদ নয়; বরং আমরা সামনের গ্রামে যাবো ।

আমি বলি,

কেন, আমরা তো এ দেশ ছেড়ে চলে যাবো?

ঠিক আছে, কিন্তু এ বিমানবন্দর থেকে নয়। কেননা, আমার খবর জানাজানি হয়ে গেলে ওরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়বে বিমানবন্দরে। বরং আমরা নিকটের কোনো এক গ্রামে গিয়ে এখন আশ্রয় নিব। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিব।

চালককে যে গ্রামের কথা বলা হয়েছে সেখানে আমরা ততক্ষণে পৌঁছে যাই। সেই গাড়ি থেকে নেমেই আরেক গাড়িতে উঠি। এবং অন্য এক গ্রামের
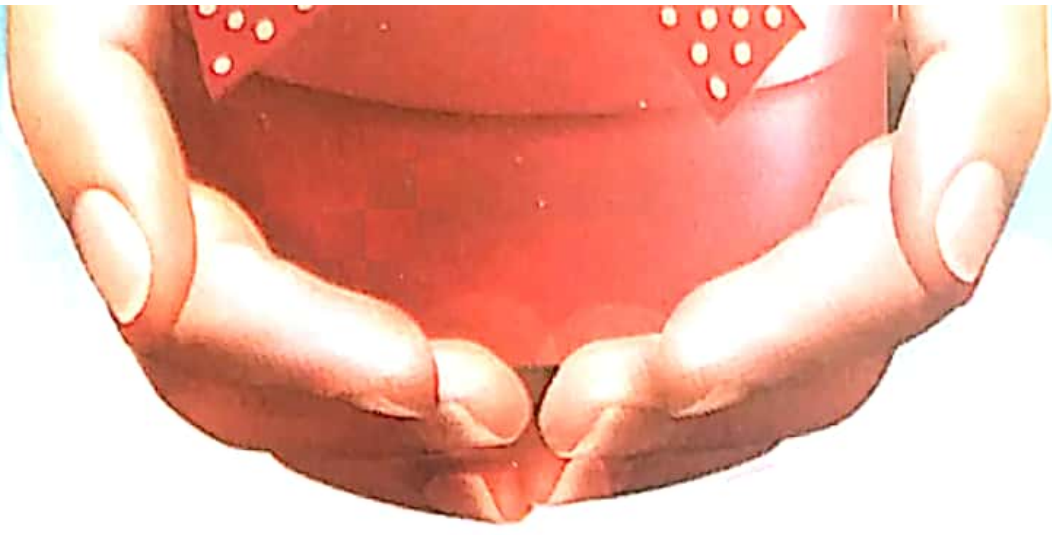
দিকে যাত্রা শুরু করি। এভাবে গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে এমন এক শহরে পৌঁছি, যেখানে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে।

বিমানবন্দরে প্রবেশ করেই আমরা নিজ দেশে ফেরার টিকেট বুক করি। কিন্তু যাত্রা বিলম্বিত হয়। তাই শহরে কয়েকদিন থাকার ব্যবস্থা করি। ছোট্ট একটা ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে উঠি।

ঘরে যখন আমরা শান্ত হয়ে বিশ্রাম নিই এবং শঙ্কাও হয়ে যায় দূর। তখন আমার স্ত্রী তার রাশিয়ান আবা খুলে ফেলে। আমি ওর দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠি!

হায় আল্লাহ!

অত্যাচার থেকে শরীরের কোনো অংশই বাদ যায়নি দেখি!

দেহের চামড়া হয়ে গেছে ক্ষতবিক্ষত।

বিভিন্ন জায়গায় শুধু ছোপ ছোপ রক্ত।

কেশগুচ্ছের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে এক সংহারী তুফান।

ওষ্ঠদ্বয় হয়ে আছে নীল।

কিন্তু চোখ দুটো জ্বলছে স্বর্গীয় আভায়।

ঠিকানা পাওয়া মানুষের জ্যোতিরলোকে।

ওর চোখ দেখে আমি ভাবতেই পারছি না যে, ওর দেহ এতটা বিধ্বস্ত। বেদনায় আমার নীরব দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসতে থাকে। অথচ তাঁকে দেখি, জাহান্নামের ওপর বসেও আনন্দে হাসছে। হ্যাঁ, সে হাসছে। এ হাসি পুষ্পের হাসি। এ হাসি নরক থেকে স্বর্গে আসার হাসি।

নিষ্ঠুরতার রাতদিন!

আমি জানতে চাই,

তোমার এমন করুণ দশা হয়েছে কীভাবে?

সে বলে,

আমি অন্দরমহলে গিয়ে সবাইকে সালাম দিয়ে সবার সম্মুখে বসি।

তারা আমার কাছে জানতে চায়,

এ কী ধরনের পোশাক পরে এসেছ তুমি?

আমি বলি,

এটি ইসলামি পোশাক।

তারা বলে, ইসলামি পোশাক! তোমার সঙ্গে এই লোক কে?

আমি বলি, আমার স্বামী। আমি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছি। আর এই মুসলিম লোকটির সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছে।

তারা বলে,

এ তো কিছুতেই হতে পারে না! এবং এটি আমরা কিছুতেই মেনে নিব না।

এরপর আমি ওই প্রতারক ব্যবসায়ীর কাহিনি তাঁদের শুনাই। বলি, কীভাবে সে আমাকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করতে চেয়েছে। তারপর কী করে আমি তার কাছ থেকে পালিয়ে তোমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি।
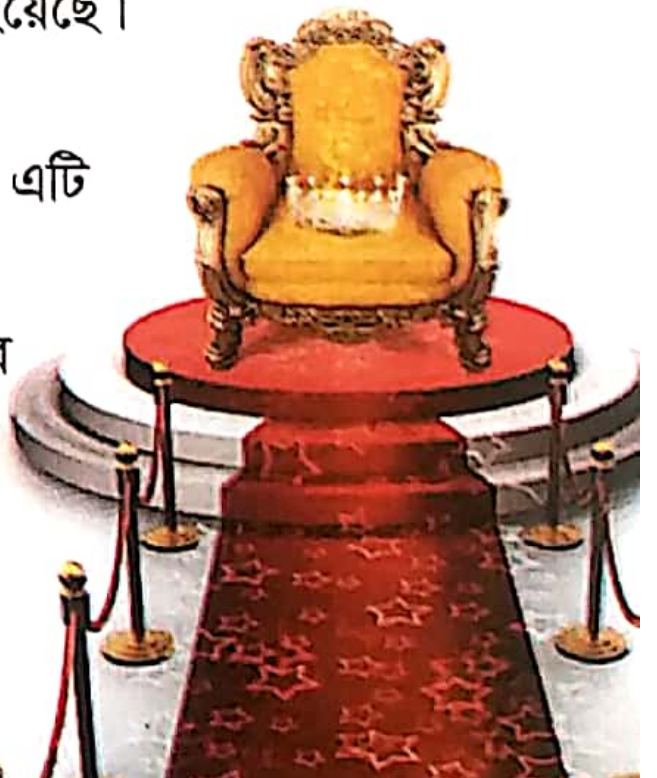
এসব শুনে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তাঁরা। কোনো সহানুভূতি ও সান্ত্বনা না দিয়ে উল্টো বলে,

মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে ফিরে আসার চেয়ে পতিতাবৃত্তিই তো ভালো ছিল!

এরপর তারা সবাই মিলে আমাকে বলে,

এ ঘর থেকে তুমি আর কখনো বের হতে পারবে না। হয় খৃষ্টধর্মে ফিরে আসবে, না হয় এখান থেকে তোমার লাশ বের হবে!

এরপর তাঁরা আমাকে বেঁধে ফেলে। আর তোমার দিকে ছুটে যায়। এবং তোমাকে মারতে থাকে। আমি শুনেছি তোমার চিৎকার ও আর্তনাদ। তুমি পালিয়ে যাওয়ার পর ওরা আবার আমার কাছে ফিরে আসে। গালি আর তিরস্কারের বিষাক্ত তীরে বিদ্ধহতে থাকি আমি।

এরপর বাজার থেকে শেকল এনে আমাকে বাঁধে শক্ত করে। তারপর শুরু হয় নিষ্ঠুরতার বেত্রাঘাত। প্রতিদিন নতুন নতুন বেত ব্যবহার করে প্রহারের জন্য। বেত্রাঘাত শুরু হয় আসরের পর থেকে, আর শেষ হয় গভীর রাতে। সকালে কেউ থাকে না আমাকে পেটানোর। সবাই বেরিয়ে যায় কাজে। মা আর পনের বছরের ছোট্ট বোনটি শুধু থাকে বাড়িতে। বোনও আমাকে নিয়ে করে হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ। এ সময়ে-ই একটু নিষ্কৃতি পাই আমি, নিষ্ঠুর এই বেত্রাঘাত থেকে।

ওদের একটাই দাবি, আমি যেন ইসলাম ছেড়ে দিই। বাপদাদার ধর্মে ফিরে যাই। আর আমি করতে থাকি অস্বীকার ক্রমাগত। আর সইতে থাকি নির্যাতন।

একদিন আমার কাছে এসে আমার ছোট বোন বলে,

আচ্ছা বলো তো, কেন তুমি আমাদের ও তোমার স্বধর্ম ত্যাগ করে কবুল করলে ইসলাম? কেন ফিরে আসবে না তোমার মায়ের ধর্মে? তোমার বাবার ধর্মে? তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্মে?

আল্লাহ্-ই বের করে দেন মুক্তির পথ!

আমি আমার বোনের এ কৌতূহলকে এক সুযোগ মনে করি। কেননা, তাঁকে বোঝানোর এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলার একটা সুযোগ পেয়ে যাই আমি। আমি তাঁকে বোঝাতে শুরু করি। ইসলামের ইতিহাস ও দর্শন খুলে খুলে। দিতে থাকি তাওহিদ ও একত্ববাদের বাণীর বিশদব্যাখ্যা। ধীরে ধীরে প্রভাবিত হতে থাকে সে। এরপর ইসলামের শাশ্বত পয়গাম ওর মনের আকাশে ছড়াতে থাকে রাঙা আলো।

কিন্তু এত দ্রুত যে, ওর কাছ থেকে ইসলামের পক্ষে সুস্পষ্ট বক্তব্য আসবে; তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমার কথা শেষ হতে না হতেই ও বলে ওঠে,

আপু! তুমি সত্যের ওপরই আছ। ইসলাম-ই সত্যধর্ম। আমিও তোমার মতো ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হব।

আপু! তুমি ভেঙ্গে পড়ো না। একটু ধৈর্য ধরো। আমি তোমাকে সাহয্য করব।

আমি বলি,

হে আমার স্নেহের বোন! যদি সত্যিই তুমি আমাকে সাহয্য করতে চাও, তাহলে আমাকে আমার স্বামীর সঙ্গে একটু সাক্ষাৎ করিয়ে দাও।

এরপর থেকেই ও ছাদে বসে বসে তোমাকে চতুরদিকে খুঁজতে থাকে। নিচে নেমে আমাকে জিজ্ঞেস করে,

আপু! দুলাভাই দেখতে কেমন?

আমি তখন তাঁকে তোমার অবয়ব বলে দিই।

এরপর একদিন ও ঠিকই তোমাকে আবিষ্কার করে ফেলে। এবং আমাকে এসে তোমার বর্ণনা দেয়। আমি বলি, তুই ঠিক-ই ধরেছিস। হ্যাঁ, ইনিই

তোর দুলাভাই। আবার যখন তোর চোখে পড়বে, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবরদিস।

সেদিন তোমাকে দেখে ও আমাকে খবর দেয় এবং সত্যি সত্যি দরজা খুলে দেয়। এরপরের কাহিনি তো তোমার জানা। আমি বেরিয়ে এসে তোমার সঙ্গে কথা বলি। কিন্তু ফটকের বাইরে আসতে পারি না। আমার হাত পা তিনটি শেকলে ছিল বাঁধা। দুটোর চাবি আমার ভাইদের কাছে আর একটির চাবি আমার বোনের কাছে। এ তৃতীয় চাবি দিয়েই সে আমাকে শেকলমুক্ত করে নিয়ে যায় বাথরুমে। এবং বাথরুম থেকে তোমার সঙ্গে কথা বলার পরই আমার স্বস্তি অনুভব হয়।

এরপর আমার বোন ইসলাম কবুল করে। তারপর আমাকে শেকলমুক্ত করে তোমার কাছে পাঠানোর জন্য সে এক গোপন অভিযানে নেমে পড়ে। সে আমার জীবন রক্ষার জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাতের ঘুম হারাম করে দেয়।

কীভাবে আমার ভাইয়ের কাছ থেকে চাবি কব্জা করা যায়, তার জন্য ফন্দিফিকির আঁটতে থাকে।

পরদিন আমার বোন ভাইদের ঝাঁঝালো মদ পরিবেশন করে, পরিমাণে একটু বেশি। সামান্য বেশি মদ খাওয়ানোর কারণে তাঁরা মাতাল হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে। পুরোপুরি চেতন হারিয়ে। আমার বোন এ সুযোগকে কাজে লাগায়। আস্তে আস্তে পকেট থেকে চাবিটা নিয়ে সোজা চলে আসে আমার কাছে। এসে বলে,

প্রস্তুত হও। এক্ষুনি বের হতে হবে। আমাকে শেকলমুক্ত করে সঙ্গে সঙ্গে সে ফটক খুলে দেয়। এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় জানায়। আমি রাতের

আঁধারকে আশ্রয় বানিয়ে তোমার কাছে চলে আসি।

এত সময় তন্ময়চিত্তে আমি আমার স্ত্রীর মুখে তাঁর মুক্তির কাহিনি শুনি। জিজ্ঞেস করি,

তবে তোমার বোন? আমার শ্যালিকা? তার ভাগ্যে কী ঘটবে?

স্ত্রী হাসিমুখে বলে,

শ্যালিকাকে নিয়ে তোমার ভয় পেতে হবে না। ওকে আপাতত ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখতে বলেছি, যতদিন না ওর জন্য কোনো ব্যবস্থা আমরা করতে না পারি।

এরপর আমরা ঘুমিয়ে পড়ি।

নির্ধারিত সময়ে দেশের উদ্দেশে রওনা হই। দেশে পৌঁছে আমি আমার স্ত্রীকে একটা ভালো হাসপাতালে ভর্তি করাই। সেখানে ওর চিকিৎসা শুরু হয়। পুরোপুরি সেরে ওঠে ও। কিন্তু এরপরও নির্যাতনের কিছু চিহ্ন থেকে যায় অবশিষ্ট।

[গল্পটি ড. ইবরাহিম আল ফারেস লিখিত একটি গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত]
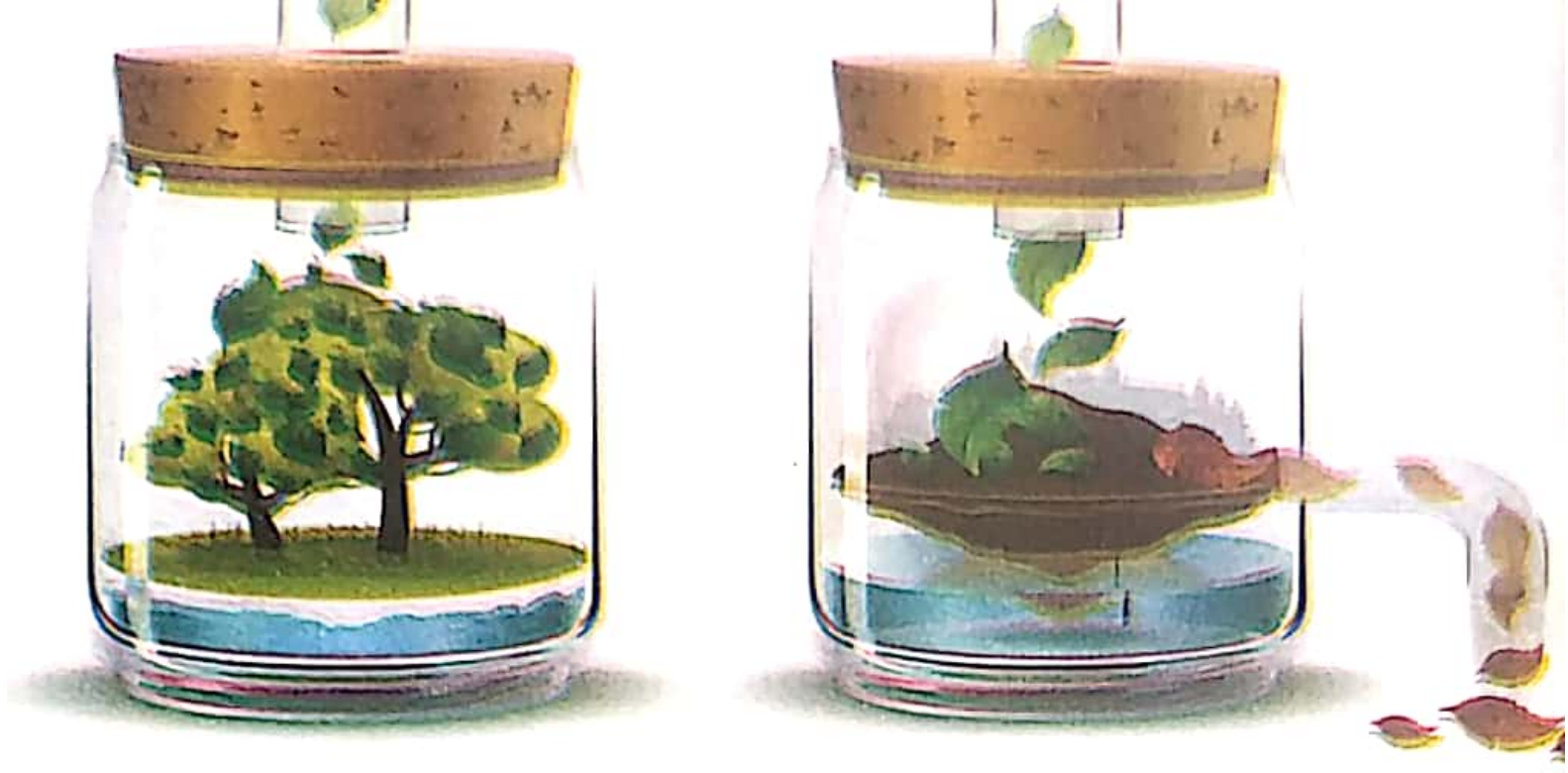
প্রিয় বোন!

তোমার আবেগ সমুদ্রে ঢেউ তোলার জন্য আমি এ গল্প বলিনি। এ গল্প বলে, তোমার চোখে বেদনার অশ্রুপ্লাবন বয়ে দেওয়াও উদ্দেশ্য নয় আমার। তোমার বিবেক ও চেতনাকে উসকে দেওয়ার জন্যও আমি করিনি এ কাহিনির অবতারণা । বরং আমি শুধু তোমাকে বলতে চেয়েছি,

ইসলামের এমন একদল বীর আছে, যারা শুধু ইসলামের নামে, ইসলামের তরে বেঁচে থাকার কিংবা মরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। ইসলামের সম্মান ও মর্যাদা উঁচু রাখার জন্য কিংবা প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজেদের মাথার খুলি গুঁড়িয়ে দিতে, বুকের তাজারক্ত ঢেলে দিতে এবং শরীরকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে।

অতীতের আবু জেহেল ও উমাইয়ারূপী দুশমনরা, কাফের-মুশরিকরা শাস্তি দিয়েছিল বেলাল, সুমাইয়াকে। মনে রাখবেন, আজো আছে সেরূপ আবু জেহেল, উমাইয়ারূপী দুশনের শিষ্য ও ধ্যানজ্ঞান সাধনা ও তপস্যা লালনকারীরা। এ দীনকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে ব্যয় হচ্ছে তাদের দিনরাতের নষ্ট প্রহর।

প্রিয় বোন আমার!

তুমি যেন ওদের শিকারে পরিণত না হও।

তুমি যেন ইসলামের সম্মানজনক ও গৌরবময় কণ্ঠাহারকে গলা থেকে ছুঁড়ে ফেলে না দাও।

তোমার এ সম্মান, ইসলামেরই দেওয়া সম্মান। এ সম্মানকে অসম্মান করবে না। এ সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে তোমাকে থাকতে হবে সবসময় সচেতন।

এসো, ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি–

প্রিয় বোন, কাবা শরিফের প্রথম বাসিন্দা কে, জানো কি তুমি!

তিনি পুরুষ নন; বরং ছিলেন একজন নারী! হাদিসের ভাষায় তাঁর কাহিনি শোনো–

ইমাম বুখারি (র.)-এর ভাষ্য অনুযায়ী হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম পবিত্র মক্কায় এসেছিলেন শাম [সিরিয়া] থেকে। তখন তাঁর সঙ্গে বিবি হাজেরা ও ছোট্ট শিশু ইসমাইল (আ.)ও ছিলেন। দুধের শিশু ইসমাইল। আল্লাহর নবী ইবরাহিম আলাইহিস সালাম, মা ও শিশুকে কাবার কাছে রেখে চলে যান। তখন মক্কার অবস্থা ছিল অনাবাদি এক বিরানভূমি। নেই সেখানে লোকালয়, নেই পিপাসাকাতর পথিকের পিপাসা নিবারণের কোনো ব্যবস্থা! হ্যাঁ, এমন মক্কাতেই তিনি রেখেগেছেন তাঁদের। দিয়ে গেছেন সামান্য কিছু খেজুর আর ছোট্ট মশকভরা সামান্য পানীয়। তারপর যাত্রা শুরু করেন তিনি শামের পথে। শিশু ইসামাইল (আ.)-এর মা, আশপাশে তাকান। দেখেন, নির্জন ভীতিকর এক মরুভূমি!

সুউচ্চ পাহাড়!

কালো কালো পাহাড়!

নেই কোনো জীবনসঙ্গী!

নেই কোনো গল্পসঙ্গী!

নেই প্রিয়জনের কোলাহল!

কীভাবে থাকবেন এই মরুউদ্যানে?

তাঁর জীবন তো কেটেছে মিসরের আলিশান রাজ প্রাসাদে! এরপর কেটেছে শাম-এর সবুজ-শ্যামল তৃণভূমিতে!

ভীষণ একাকীত্ব অনুভব করতে থাকেন তিনি।

তাকালেন স্বামীর দিকে। চলে যাচ্ছেন তিনি। যাত্রাপানে একটু অগ্রসর হয়ে বলেন,

হে আমার প্রিয় জীবনসঙ্গী! এ জনমানবহীন মরুভূমিতে আমাদের ছেড়ে আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম কোনো উত্তর দেন না। একটু ফিরেও তাকান না। বিবি হাজেরা আবার একই কথা জিজ্ঞেস করেন। এবারও মিলে না কোনো সাড়া আল্লাহ তাআলার নবী ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে। আবার উচ্চারিত হয় বিবি হাজেরার কণ্ঠে উদ্বেগমাখা সেই জিজ্ঞাসা! এবারও তিনি নিরুত্তর ও ভ্রূক্ষেপহীন। বিবি হাজেরা যখন দেখলেন, প্রিয় স্বামী তাঁর কথায় মোটেও ভ্রূক্ষেপ করছে না; বরং অজানা কোনো কারণে হয়তো তিনি তাঁকে এড়িয়ে যাচ্ছেন বারবার। তখন প্রশ্নের ধরন ও বিষয় বদলে ফেলেন। জানতে চান,

তাহলে কি মহান আল্লাহ তাআলার

হুকুমে-ই আপনি আমাদের এখানে রেখে যাচ্ছেন?

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বলেন, হ্যাঁ।

এবার বিবি হাজেরা বলেন,

তাহলে আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই আমাদের করবেন সাহায্য। আল্লাহর হুকুমের প্রতি আমি পূর্ণ সন্তুষ্ট। আমাদের কখনো তিনি বিপদে ফেলবেন না।

এরপর ইবরাহিম আলাইহিস সালাম চলে যান শামে।

আর বিবি হাজেরা থেকে যান নিজের এই নতুন আবাসে। এ কঠিন ও নির্জন মরুবাসকেই শেষ পর্যন্ত তিনি মেনে নিলেন সানন্দে।

চলতে চলতে যখন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম একটি পাহাড়ের উপত্যকায় নামেন এবং চলে যান স্ত্রী-পুত্রের দৃষ্টির আড়ালে। তখন পথচলা বন্ধ করে দেন। থেমে যান। দাঁড়ান বাইতুল্লাহ অভিমুখী হয়ে। তারপর দুহাত প্রসারিত করে আসমানের দিকে ওঠান। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

এবং উচ্চ কণ্ঠে বলেন,

رَبَّنَآ اِنِّيۡۤ اَسۡكَنۡتُ مِنۡ ذُرِّيَّتِيۡ بِوَادٍ غَيۡرِ ذِيۡ زَرۡعٍ عِنۡدَ بَيۡتِكَ الۡمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ فَاجۡعَلۡ اَفۡـئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهۡوِىۡۤ اِلَيۡهِمۡ وَارۡزُقۡهُمۡ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡكُرُوۡنَ ﴿٣٧﴾

হে দয়াময় আমার রব! আমি আমার বংশধরদের মধ্য থেকে কয়েকজনের আবাস বানিয়ে আসলাম অনুৎপন্ন উপত্যকায়; তোমার সম্মানিত গৃহের নিকট। হে আমার প্রতিপালক! যেন তারা সালাত কায়েম করে। সুতরাং তাঁদের প্রতি তুমি কিছু লোকের অন্তর অনুরাগী করে দাও এবং তাঁদের জন্য তুমি রিজিকের ব্যবস্থা কর ফলফলাদি দ্বারা। যাতে তাঁরা তোমার শুকরিয়া আদায় করে।

এরপর ইবরাহিম আলাইহিসসালাম শামরাজ্যের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান। আর বিবি হাজেরা শিশুপুত্র ইসমাইলকে বুকে তুলে নেন। দুধ পান করান। তারপর পিতা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের রেখে যাওয়া পানি পান করান। ছোট্ট মশকের অল্প কিছু পানি একদিনে শেষ হয়ে যায়। তিনি নিজেও পিপাসার্ত হন। তাঁর দুধেরশিশুও হয় পিপাসার্ত। ধীরে ধীরে পিপাসা আরও বাড়তে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে শিশুপুত্রের তড়পানো বাড়ে। মায়ের বেকারারি! তীব্র পিপাসায় শিশুপুত্র ইসমাইল (আ.) একপর্যায় মোচড়ায়। ঠোঁট চাটে। হাত-পা ছুঁড়তে থাকে জমিনে। পাশে দাঁড়িয়ে অসহায় মা দেখেন, শিশুর ছটফটানি, গড়াগড়ি! মৃত্যুর সঙ্গে যেন পাঞ্জা লড়ছে ও! বিবি হাজেরা ব্যাকুল চোখে তাকান আশপাশে!

কোনো দরদী বন্ধু কি আছে? নেই।

আছে কি কোনো সাহায্যকারী? নেই।

তাহলে কি তাঁর চোখের সামনে মরে যাবে প্রিয় কলিজার টুকরা?

কী করে দেখবেন তা তিনি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

কিংবা পাশে বসে বসে? উঠে যান। ওর কাছ থেকে চলে যান। মায়ের সামনে প্রিয় সন্তানের মৃত্যু হবে আর মা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবেন! তা হতে পারে না।

কিছুই কি তার করার নেই? কী করবেন তিনি? কোথায় যাবেন? হঠাৎ চোখে পড়ে, সাফা পাহাড়! ছুটে যান সেখানে। চড়লেন তার চূড়ায়। যদি সেখান থেকে দেখা যায় কোনো বেদুইন কিংবা মরুকাফেলা! কিন্তু না, সাফার চূড়ায় ওঠেও কোনো মানুষের কিংবা কোনো কাফেলার নামনিশানাও যায় না দেখা। নেমে এলেন সাফা থেকে। এবার ছুটে যান উপত্যকা ধরে, মারওয়া পাহাড়ের দিকে। উপত্যকার মধ্যখানে এসে জামার আঁচল নেন গুটিয়ে। ক্লান্ত পুরুষের মতো দৌড়াতে

থাকেন, মারওয়া অভিমুখে। উপত্যকা পেরিয়ে দ্রুত উঠতে থাকেন মারওয়ার চূড়ায়। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখেন চারপাশ। না, এখানে দাঁড়িয়েও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তাহলে এখন কী করা যায়? আবার ছুটবেন কি সাফার দিকে? হ্যাঁ, আবার ছুটলেন সাফার দিকে। সেখান থেকে আবার মারওয়ায়। আবার সাফায়। আবার মারওয়ায়। এভাবে সাফা-মারওয়া দৌড়ালেন সাতবার।

সপ্তমবার যখন মারওয়ার কাছাকাছি এলেন, তখন শুনতে পান একটা ধ্বনি! থমকে দাঁড়ান! আপন মনে বলে ওঠেন! চুপচাপ থাকি, দেখি কী বলা হচ্ছে! আবারও শুনার চেষ্টা করেন সেই ধ্বনি। আবার আপন মনে বলে ওঠেন, কী শুনলাম একটু আগে? আছে কি আশপাশে কোনো সাহায্যকারী! না, এবারও মিলে না কোনো সাড়া। এবার তাকান তিনি শঙ্কাভরা চোখে তাঁর কলিজার টুকরার দিকে! হায় আল্লাহ! তোমার কী কুদরত! কী কারিশমা তোমার কুদরতের! ঠিক জমজম-এর জায়গায় কলিজার টুকরা যে তাঁর পদাঘাত করছে! হাত চাপড়াচ্ছে! আর ওই তো! ঠিক সেখান থেকেই মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে স্বচ্ছ পানির একটা ঝরনা ধারা!

মা হাজেরা দ্রুত ছুটে যান সেই পানির দিকে! আবে জমজমের দিকে! আবে হায়াতের দিকে! দ্রুত হাত দিয়ে পাড় বাঁধেন। পানি আটকান। তারপর আঁজলা ভরে পানি নিয়ে মশক ভরেন! যদি পানি শেষ হয়ে যায়? কিন্তু পানি তো শেষ হচ্ছে না! তীব্র বেগে জমিন থেকে পানি উতলে উঠছে! অদূরে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন স্বর্গীয় দূত হজরত জিবরাইল আমিন। হ্যাঁ, কাছে এসে মা হাজেরাকে বলেন,

শঙ্কিত হয়ো না হে নারী! এ পানি শেষ হবার নয়! ফুরিয়ে যাবার নয়! এখানেই রয়েছে আল্লাহর ঘর! তা অচিরেই নির্মিত হবে এ শিশু ও তাঁর পিতার হাতে!

হে পুণ্যবতী হাজেরা!

তোমার ধৈর্য অতুলনীয়!

তোমার ধৈর্যের কাহিনি বিস্ময়কর!

এ ভীতিকর অবস্থায় আল্লাহর ইচ্ছাকে বাস্তবায়নের যে লড়াই তুমি করেছ এবং যে বীরত্ব তুমি দেখিয়েছ, পৃথিবীর আর কোনো নারীকে ইতিহাসে এ নমুনা স্থাপনের জন্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তোমার নমুনা শুধু তুমিই! তোমার দৃষ্টান্ত শুধু তুমিই!

এটি বিবি হাজেরার আত্মত্যাগের অবিস্মরণীয় এক ঘটনা। যাঁর ধৈর্যের কাহিনি, যাঁর ত্যাগের কাহিনি আজও অজুতনিযুত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। এবং এটিই অসংখ্য অগণিত হাজেরাপ্রেমীর পথ চলার পাথেয়। কিন্তু এটা তো তাঁর সম্মানের...ছোট্ট এক নিদর্শন। তিনি তো এ ক্ষুদ্রতা থেকে অনেক ওপরে অবস্থান করছেন।

তাঁর আলোচনা তো আল্লাহর কালাম কুরআনমাজিদে উল্লেখ আছে! আল্লাহ তাঁকে নবীপত্নী ও নবীমাতা বানিয়েও করেছেন সম্মানিত। তিনি নবীদের মা! তিনি ওলিদের আদর্শ!

হ্যাঁ, ইনি হলেন বিবি হাজেরা!

এই হলো তাঁর পুরস্কার।

হ্যাঁ, তিনি মরুবাসী হয়েছেন!

সেখানে ভয়ভীতিরও শিকার হয়েছেন!

পিপাসার্ত হয়েছেন! ক্ষুধার্ত হয়েছেন!

কিন্তু যখন জেনেছেন এ-সবই কুদরতের ইশারায়, তখন মেনে নিয়েছেন সসম্মানে অবনত শিরে এ কঠিন মরুবাসও!

তিনি নির্বাসিত জীবনযাপন করেছেন, কিন্তু আল্লাহর পথে। তাই তাঁকে আল্লাহ দিয়েছেন পরবর্তী সময়ে অনাবিল সুখ ও আনন্দ। করেছেন ভাগ্য সুপ্রসন্ন। এমন নারীর এমন নির্বাসনকে লক্ষ্য করে তুমি যদি বলো, وَطُوْبى لِلْغُرَبَاءِ তাহলে পারো বলতে। জানো? কারা এই غُرَبَاءِ?

যারা আল্লাহর সৎ বান্দা ও পুণ্যবান বান্দা তাঁরাই হলো এ غُرَبَاءِ।

অজস্র অসৎ ও নষ্ট মানুষের ভিড়ে–

يَقْبِضُوْنَ عَلَى الْجَمْرِ * يَمْشُوْنَ عَلَى الصَّخْرِ
وَيَبِيْتُوْنَ عَلَى الرَّمَادِ * وَيَهْرِبُوْنَ مِنَ الْفَسَادِ

এঁরা প্রয়োজনে জ্বলন্ত আঙ্গারকেও আঁকড়ে ধরে!

কঠিন প্রস্তরকেও বানায় [মসৃণ] পথ!

অগ্নিআঙ্গারের ওপর এঁরা রাত কাটায়!

যত আছে অন্যায়-অনাচার আর পাপ-পঙ্কিলতা,

এঁরা তা থেকে পালিয়ে বেড়ায় নিরন্তর!

হ্যাঁ, সত্য ওদের কথা! কোনো পাপস্পর্শ করেনি ওদের লজ্জাস্থান। দৃষ্টি ওদের মুক্ত পাপচাহনি থেকে।

ওদের কথায় নেই কোনো ছল-চাতুরির রং। ওদের মজলিসে নেই

কোনো গিবতশেকায়েত, পরনিন্দা, পরচর্চা।

ওরা যখন দাঁড়ায় আল্লাহর সকাশে।

সাক্ষী হয়ে যায় ওদের পক্ষে ওদেরই হাত-পা।

কথা বলে ওঠে ওদের কান।

চঞ্চল হয়ে ওঠে ওদের চোখ।

ওরা আনন্দিত হয় আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে।

সুসংবাদ দিয়ে ওরা হয় আপ্লুত।

ওদের বিপক্ষে সাক্ষী দিতে পারে না এমন চোখ, যা দেখেছে পরনারী। এমন কান, যা শুনেছে অবৈধ গান। বরং ওদের পক্ষে সাক্ষী হয়, এমন চোখ, যা কেঁদে কেঁদে হয় সারা। যখন আসে জিহাদের ডাক, আত্মত্যাগের কথা তখন ওদের জন্য হয়ে যায় সবচেয়ে সহজ কাজ।

হ্যাঁ, এরাই غُرَبَاءِ! তুবা লিল গুরাবা।

হে নাম না জানা নারী, ধন্য তোমার কুরবানি!

এ কাহিনি ফেরাউন কন্যার এক পরিচারিকার। কেশবিন্যাসকারিনীর। ইতিহাস আমাদের জন্য তাঁর নাম সংরক্ষণ করে রাখেনি, তবে তাঁর কর্ম সংরক্ষণ করে রেখেছে। তাঁর ত্যাগ সংরক্ষণ করে রেখেছে। তাঁর কুরবানি সংরক্ষণ করে রেখেছে। সেই ত্যাগের কাহিনিই এখন তোমাকে শুনাচ্ছি, হে নারী!

তিনি ছিলেন এক সতী মহিলা। তিনি এবং তাঁর স্বামী থাকতেন ফেরাউনের আশ্রয়ে। তাঁর স্বামী ছিল ফেরাউনের প্রিয়ভাজন। নিকটজন। ফেরাউনের আশ্রয়ে থাকলেও তাঁরা ইমান কবুল করে ধন্য হয়েছিলেন গোপনে। হঠাৎ কী

উপায়ে যেন ফেরাউন মহিলার স্বামীর ইমান আনার কথা জেনে যায়। আর নিস্তার কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে হত্যার নির্দেশ। কিন্তু মহিলার বিষয়টি থাকে গোপনই। ফেরাউনের প্রাসাদে ফেরাউন কন্যাদের কেশবিন্যাস করে তাঁর জীবন চলে। বিনিময়ে যা পেতেন তা দিয়ে নিজের পাঁচ সন্তানের ভরণপোষণ চালাতেন বেশ কষ্টে। বড় ভালোবাসতেন তিনি তাঁর সন্তানদের।

নিত্যদিনের মতো একদিন তিনি ফেরাউন-তনয়ার কেশবিন্যাস করছিলেন। অসতর্কতাবশত হঠাৎ তাঁর হাত থেকে চিরুনি নিচে পড়ে যায়। তখন হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত ইমানি কথা 'বিসমিল্লাহ' মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ফেরাউন তনয়া বিস্মিত হয়ে বলে,

এই! আল্লাহর নামে মানে! আমার আব্বার নামে তো!

তখন কেশবিন্যাসকারিনী মহিলার ইমানি গায়রত আরও উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে, না, আল্লাহর নামে! আর কতসময় ইমানি জযবা রাখা যায় চেপে? পারেন না ইমানকে আর লুকিয়ে রাখতে! তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলেন,

অসম্ভব! বরং আল্লাহরই নামে! যিনি আমার রব! তোমার রব! তোমার আব্বারও রব!

তখন ফেরাউন তনয়া বেশ বিস্মিত হয়ে ভাবে, তার আব্বা ছাড়া আরও কি কেও প্রভু হতে পারে? কারও ইবাদত করা যেতে পারে?

এ কথা ফেরাউন তনয়ার পেটে আর হজম হয় না। বিষয়টা সে বাবাকে জানিয়ে দেয়। ফেরাউনও বিস্মিত হয়ে ওঠে। ভাবে, তাহলে তার প্রাসাদে তাকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদতও করা হয়?

এরপরই শুরু হয় ফেরাউনিতাণ্ডব! সর্বগ্রাসীতাণ্ডব!

কালবিলম্ব না করে মহিলাকে ডাকা হয়। আসতেই ফেরাউন জিজ্ঞেস করে,

তোমার রব কে?

মহিলা বলে,

আমার এবং আপনার রব একজনই। আর তিনি হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন!

সঙ্গে সঙ্গে ফেরাউন নির্দেশ দেয় তাঁকে বন্দী করার। তাঁর বিশ্বাস থেকে তাঁকে সরে আসার নির্দেশ দেয়। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য চালায় অমানবিক বেত্রাঘাত ।

কিন্তু ফেরাউনের ইচ্ছা পূরণ হয় না। মহিলা ইমান বিসর্জন দেয় না। ফেরাউন তখন পিতলের বড় একটা পাতিল নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়। নিয়ে আসা হয় বড় এক পাতিল। তারপর তাতে তেল ভরে গরম করা হয়। তেল গরম হয়ে করতে থাকে টগবগ। এরপর মহিলাকে পাতিলের কাছে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়নির্দেশ দেয়। মহিলা এসব আয়োজন দেখে বুঝতে পারে– তাঁর আয়ু এসেছে ফুরিয়ে। কিন্তু ঘাবড়ায় না। ইমানের পথ থেকে সরে আসে না। ভাবে, জীবন তো একটাই। ইমান আনার কারণে এই এক জীবনের সেতু পেরিয়ে সময়ের আগেই যদি দীদারে মাওলা নসিব হয়, তাহলে কেন আমি লাব্বাইক বলব না!

ফেরাউন জানত, মহিলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় তাঁর পাঁচ এতিম সন্তান। ওদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে সে তাঁর প্রাসাদে কাজ করেই। ফেরাউন মহিলাকে শক্ত আঘাত করতে চাইল! যাকে বলে ফেরাউনিতাণ্ডব! তাই সে তাঁর পাঁচ সন্তানকে তাঁর সামনে হাজির করার নির্দেশ দেয়।

ধরে আনার সময় ওরা বুঝতে পারে না কোথায় তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং কেন নেওয়া হচ্ছে? কিন্তু যখন মাকে দেখে শেকলবাঁধা, ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর কোলে।

কাঁদতে কাঁদতে মাও তাঁদের আঁকড়ে ধরে। মুখেমুখে মুখ মিলায়। চোখেচোখে চোখ ঘষে। কলিজার টুকরা এতিম মানিকদের শরীরের ঘ্রাণ নেয়। স্নেহাশ্রু ওদের ওপর টপটপ করে পড়ে। আদরের ছোট্ট শিশুকে বুকে তুলে নেয়। সোহাগভরে বুকের দুধ খাওয়ায়।

ফেরাউন মাতৃমমতার এ দৃশ্য দেখে মনে মনে হাসে। শুরু করে নিষ্ঠুরতার খেলা। সর্বপ্রথম বড় ছেলেকে টগবগে তেলে ফেলে হত্যা করার নির্দেশ দেয়! সৈন্যরা সঙ্গে সঙ্গে তার হুকুম পালন করে। মায়ের কোল থেকে ওকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে থাকে সেই গরম তেলের দিকে। আহা! ছেলের তখন সে কী কান্না! মা! মা! বলে চিৎকার করছে। সৈন্যদের কাছে মিনতি করছে। ফেরাউনের কাছে বিনয় জানাচ্ছে। কান্নার সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা ছুঁড়ছে। করুণ কণ্ঠে ডাকছে ছোটভাইদের নাম ধরে ধরে। এদিকে পাষণ্ড সৈন্যরা ওর হাতে আঘাত করছে। মুখে থাপ্পর মারছে। মা করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে প্রিয় সন্তানের দিকে! অশ্রুসিক্ত নয়নে! বিদায়মাখা চাহনিতে!

কিছুক্ষণের ভেতরেই বালককে

নিক্ষেপ করা হয় টগবগে ফুটন্ত তেলে! মা এ অসহনীয় দৃশ্য দেখলেন দম বন্ধ করে। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে। অন্য ভাইয়েরা সহোদরের এমন করুণ অবস্থা দেখে মুখ ঢাকে ছোট ছোট কোমল হস্তে! ওদের আর্তচিৎকার থেকে যেন ভেসে আসছে, তোমরা কেন আমাদের ভাইয়াকে মেরে ফেললে? এখন আমাদের আদর করবে কে? তোমরা খারাপ। তোমরা নষ্ট। তোমরা অমানুষ।

মুহূর্তেই ছোট্ট দেহের রেশম-কোমল হাড্ডিগুলো গলে যায়। সাদা হয়ে ওপরে ভেসে ওঠে। ফেরাউন এরপর তাকায় মহিলার দিকে। কুটিল চোখে। নিষ্ঠুর পাশবিকতায় নৃত্য করছে তার চোখের তারা। ফেরাউন মহিলাকে আবার ইমান থেকে ফিরে আসতে বলে। মহিলাও আবার অস্বীকার করে। ফেরাউন আরও ক্ষুব্ধ হয়। দ্বিতীয় সন্তানকে নিক্ষেপ করার হুকুম দেয়! তখন সৈন্যরা মায়ের কাছ থেকে তাঁকেও আগের সন্তানের মতো হেঁচকা টান মেরে নিয়ে যায়। একটু পর সেও নিক্ষিপ্ত হয় তাঁর ভাইয়ার মতো। মা এক সন্তান চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখেছেন একটু আগে! এখন দেখছেন আরেকজনের চলে যাওয়ার দৃশ্য! অশ্রুপ্লাবিত চোখে! হ্যাঁ, একটু পর তার হাড্ডিও গলে যায়। সাদা হয়ে ওপরে ভেসে ওঠে! না! মা অবিচল। ইমানও তাঁর অটল। তাঁর রবের সঙ্গে মিলনস্বপ্নে বিভোর হয়ে আছেন তিনি।

এরপর তৃতীয়জনের পালা। একই নিষ্ঠুরতার দৃশ্য! না! তবুও মা টলে না! ইমান থেকে ফিরে ফেরাউনের প্রভুত্বে যায় না! প্রভুত্ব তো একমাত্র আল্লাহর। এ বিশ্বাস থেকে টলে গেলে যে জাহান্নামের তপ্ত আগুন হবে সব সময়ের ঠিকানা! সর্বক্ষণ সেই চিন্তায় মগ্ন তিনি!

মার এমন অবিচলতা দেখে ফেরাউনের মাথার রক্ত হয়ে ওঠে, শিরায় শিরায় স্পষ্ট। এবার চতুর্থ সন্তানের পালা। নিষ্ঠুরতা চালানো হয় একই ধরনের। ও ছিল বেশ ছোট! মায়ের আঁচল ধরে সে কী কান্না! সে কী চিৎকার! পাহাড়-টলা

চিৎকার! সৈন্যরা যখন টেনে ওকে মায়ের আঁচলমুক্ত করে, তখন ও ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের পায়ে। আঁকড়ে ধরে মাতৃপদদ্বয়! শিশুময় অশ্রুতে ভেসে যায় পদদ্বয়! তবুও ফেরাউনের নিষ্ঠুর হৃদয়ে ন্যূনতম দয়ার হয় না উদ্রেক! মা ওকে আবার কোলে নিতে চায়। চুমু দিয়ে শেষ বিদায় জানাতে চায়। বাঁধ সাধে নিষ্ঠুর সৈন্যরা। ছোট্ট শিশু! মুখে ঠিকমতো কথাও ফোটেনি এখনো। শোনা যাচ্ছে শুধু অবোধগম্য আওয়াজের কাতর মিনতি! না বোঝা ভাষায় কী যেন বলছে ও? ও কি বলছে?

মা! আমি মরতে চাই না। আমি বাঁচতে চাই। আমি চলে গেলে আমার ছোট্ট ভাইয়াকে রোজ রোজ আদর করবে কে? চুমু খাবে কে? মা! সত্যি কি ফেরাউন আমাকে এই গরম তেলে পুড়ে মারবে? কেমনে সইবো আমি আগুনের তাপ?

কয়েক মুহূর্ত পরেই ভেসে ওঠে ছোট্ট শিশুটির সাদা সাদা কোমল হাড্ডি। একে একে চারটি মানিকের নৃশংস হত্যা দেখলেন স্নেহময়ী মা! নীল বেদনায় পাথর হয়ে! তাঁর দুচোখ বেয়ে চলেছে শোকাশ্রুর বন্যা!

আহা! তাঁর সন্তানদের চিরবিচ্ছেদবেদনা কীভাবে সইবেন তিনি! বিশেষ করে এইমাত্র নিষ্ঠুরতার বলি হওয়া ছোট্ট মানিকের বেদনা! যাকে কত আদর করেছেন তিনি। দিয়েছেন কত সোহাগমাখা চুমু! ও যখন রাতে ঘুমাতো না, তাঁকেও তখন নির্ঘুমই কাটাতে হতো রাত। ও যখন কাঁদতো তিনিও কাঁদতেন। রাতের পর রাত ও তাঁর কোল জড়িয়ে... বুক জড়িয়ে ঘুমিয়েছে। তাঁর চুল নিয়ে খেলা করেছে। মাঝে মধ্যে তিনি নিজেই হয়েছেন ওর খেলার সঙ্গী। ও আজ নেই! ও আজ নিষ্ঠুরতার শিকার। হায়! এমন বেদনা যে সইবার নয়!

মহিলা বারবার চোখে আঁচলচাপা দিচ্ছিলেন। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছিলেন। এরই মাঝে নিষ্ঠুর সৈন্যরা তাঁর দিকে আবার এগিয়ে

আসে। যেন একদল দানব এগিয়ে আসে ধাক্কাধাক্কি করতে করতে।

দুগ্ধপুষ্য শিশুর মুখে কথা ফুটে, তবুও ফেরাউনের হয় না দয়া!

পাষাণের দল এবার মায়ের শেষ কলিজার টুকরা–দুগ্ধপুষ্য নবজাতককে ধরে নিয়ে যায়! ও তখন হাসিমুখে বুকের দুধ খাচ্ছে। কী ঘটছে, সে কী-ইবা বোঝে! কিন্তু যখন পাষণ্ডরা হেঁচকা টান মেরে ওকে নিয়ে যায়, তখন তাঁর বিলাপ, তাঁর কান্না আকাশ-বাতাস ভারি করে তুলে। আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসে মায়ের বিচ্ছেদবেদনার হৃদয় থেকে। সেকি করুণদৃশ্য!

আল্লাহ যখন দেখলেন মায়ের বিচ্ছেদযন্ত্রণা ও সন্তানহারা বেদনার কাতরতা, তখন ঢেউ ওঠে তাঁর কুদরতের সাগরেও! তিনি তখন ওই ছোট্টনবজাতকের মুখেই ভাষা দান করেন! নবজাতক মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে,

يَا أُمَّاهُ اِصْبِرِيْ فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ.

হে আমার মা! ধৈর্য ধরো! তুমি সত্যের ওপর অটল আছ!

এ বাক্য বলেই সে আবার নির্বাক হয়ে যায়! সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে যায় টগবগে গরম তেলের ভেতর!

তখন ওর মুখে মায়ের বুকের দুধের সাদা চিহ্ন লেগেছিল! হাতে ধরা ছিল মায়ের মাথার কয়েকটি কেশ! তার জামাটা সিক্ত ছিল মায়ের তপ্তাশ্রুর বেদনাধারায়! একটু পরই ভেসে ওঠে তাঁরও গলিত সাদা হাড্ডি। এভাবেই মায়ের চোখের সামনে শেষ হয়ে যায় পাঁচটি তাজা গোলাপ!

কোলাহলমুখর একটি বাগানে যেন ঝড় বয়ে যায়। এবং নীরব হয়ে যায় সব। পাখি নেই, কাকলিও নেই। বৃক্ষ

নেই, ফুলও নেই। কোকিলও নেই, গানও নেই। নেই কোনো স্পন্দন।

আর কখনো ওরা মাকে মা বলে ডাকবে না। কোনো বায়না ধরে আঁচল টান দেবে না! এখন তাঁরা অন্যলোকের বাসিন্দা! শহিদি কাফেলার সদস্য তাঁরা। শুহাদাদের ছোট্ট ছোট্ট নক্ষত্র তাঁরা! এখন কী আছে তাঁদের? কিছুই নেই। আছে শুধু হাড্ডিগুলো। সাদা সাদা কচি হাড্ডি। টগবগে তেলের ওপর একবার ভাসছে, একবার ডুবছে। আবার ভাসছে আবার ডুবছে। অসহায় অবলা নারী শুধু তা দেখে অশ্রু ঝরায়। অশ্রু ছাড়া তাঁর আছেই বা কী! আহা! তিনি তো মা! কেমনে সইবেন মা এ যন্ত্রণা? তাকিয়ে থাকবেন কেমনে এই হাড্ডিগুলো[illegible]কে? কার হাড্ডি এগুলো? যারা গৃহ মাতিয়ে রাখত দিগবিদিক ছুটে ছুটে। কোল জুড়ে বইতো তখন তাঁর আনন্দের ফল্গুধারা!

হাসি আনন্দে আর সুখ-উল্লাসে কেটে যেত সারাবেলা! কখনো যদি কেঁদেছে তাঁরা, আহা! তখন মায়ের কী যে মমতা! আদর দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, আর মন ভোলানো সান্ত্বনা দিয়ে দূর করে দিতেন সব গাল ফোলানো, চোখ ঝরানো ছোট্ট ছোট্ট দুঃখ-বেদনা।

বায়না ধরার সেই রঙিন দিনগুলো আর আসবে না। আসবে না উৎসবে আনন্দে নতুন পোশাকের সেই আনন্দঘন অতীত! এরা সেসব থেকে এখন দূরে, বহু দূরে।

একটু পর আসছে তাঁরও পালা! এই ভালো! যে পথে কুরবান হয়েছে বুকের ধন, সেই পথেই যাবেন তিনি! অথচ ইচ্ছে করলে এখন বেঁচে যেতে পারেন! শুধু কি তাই! বাঁচাতে পারতেন ওই বুকের ধন পাঁচ শিশুকেও। শুধু একটি কথা উচ্চারণ করে! ফেরাউনকে
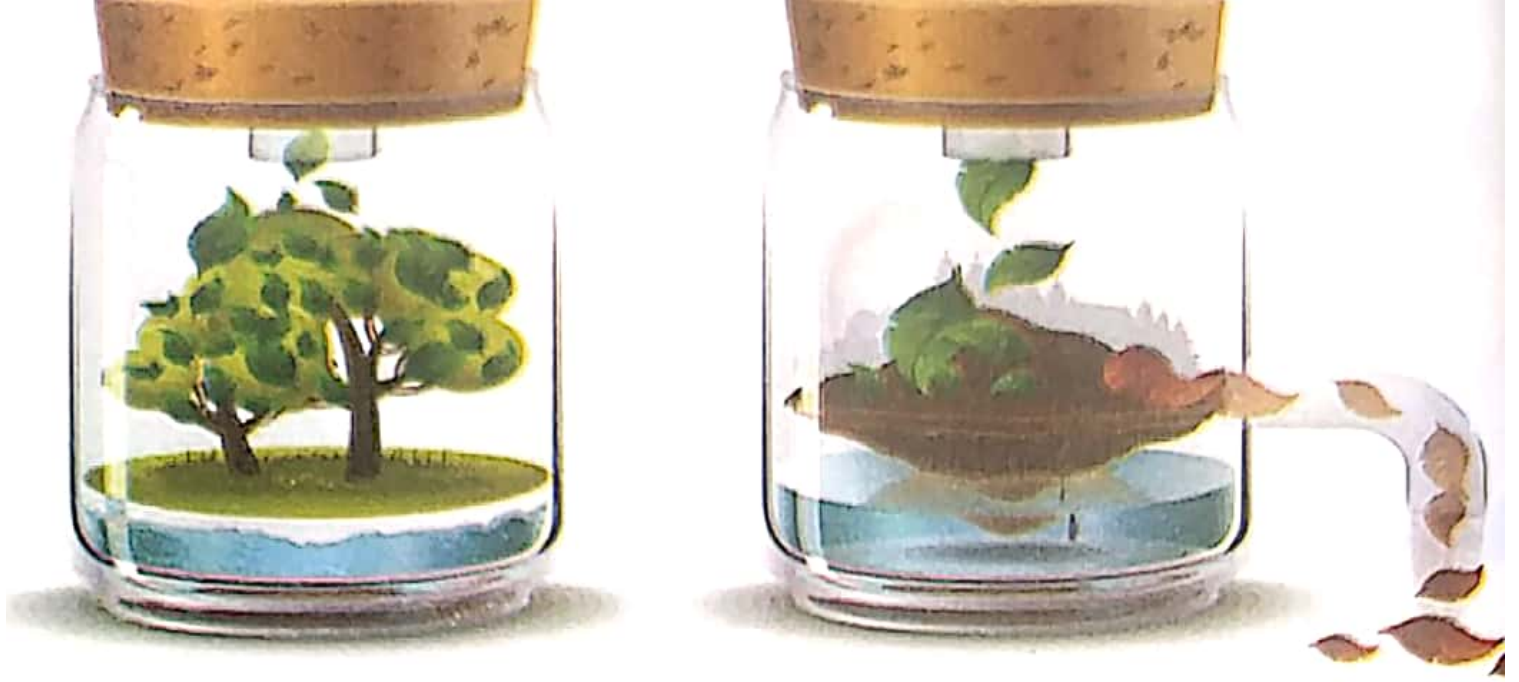
শুনিয়ে একটি কুফুরি বাক্য উচ্চারণ করে! কিন্তু সে যে মানা! ইমানের ফুলবাগানে প্রবেশ করে কেউ কি ফিরে যেতে চায় কুফুরির কণ্টকবনে? ফেরাউনের কাছে আঁধার ছাড়া আর আছে কী? অথচ আল্লাহর কাছে আছে আলো আর আলো। শান্তি আর শান্তি। প্রাপ্তি আর প্রাপ্তি। যার সবকিছুর শিরোনাম, জান্নাত! জান্নাত!! জান্নাত!!!

এরপর ঘটল কী? যা ঘটল তা প্রত্যাশিতই ছিল। হিংস্র শিকারী কুকুরের ন্যায় সৈন্যরা তাঁর দিকে ধেয়ে আসে এবং ধরে নিয়ে যায় উত্তপ্ত তেলের হাড়ির দিকে! এক্ষুনি তাঁকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে। তিনি তাকালেন, অগ্নিময় হাড়ির ভাসমান পাঁচ সন্তানের হাড্ডিগুলোর দিকে। তখন তাঁর মনে এক বাসনা জাগে। ফেরাউনের দিকে তাকায়। বলে, আমার শেষ একটা চাওয়া আছে, তোমার কাছে।

চিৎকার করে ফেরাউন বলে,

আমার নিকট তোমার আবার কিসের চাওয়া আছে?

তিনি বলেন, আমার এবং আমার সন্তানদের হাড়গুলো জড়ো করে এক সঙ্গে আমাদের দাফন করবে।

এরপরই হাড়িতে ছুড়ে মারা হয় তাঁকে, টগবগে তেলে পুড়ে যায় পুরো দেহ! বেরিয়ে যায় তাঁর অশান্ত আত্মা! চলে যায় আল্লাহর কাছে! পড়ে থাকে শুধু তাঁর নিথর দেহ!

হে মহীয়সী নারী, বৃথা যায়নি
তোমার কুরবানি!

দৃঢ়তা তাঁর মহান! পুরস্কারও হবে আল্লাহর কাছে তাঁর মহান!

মিরাজ রজনিতে আল্লাহর নবী রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু দেখেও এসেছেন তাঁর পুরস্কারের নমুনা! এসে তাঁর সাহাবিগণকে জানিয়েছেন। ইমাম বায়হাকি সেই অবস্থার বর্ণনা তুলে ধরেছেন এভাবে–

لَمَّا أُسْرِيَ بِيْ مَرَرْتُ بِيْ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ...فَقُلْتُ : مَا هَذِهِ الرَّائِحَةُ؟ فَقِيْلَ لِيْ : هَذِهِ مَاشِطَةُ بِنْتِ فِرْعَوْنَ وَأَوْلَادُهَا.

মিরাজ রজনিতে আমি এক ঘ্রাণ অনুভব করি। জিজ্ঞেস করি, এ ঘ্রাণ কিসের? তখন আমাকে বলা হয়, এ হলো ফেরাউনকন্যার কেশবিন্যাসকারিনী ও তাঁর সন্তানদের ঘ্রাণ।

আল্লাহু আকবার! শাস্তি সামান্য, পুরস্কার কী অসামান্য! দুনিয়াতে তিনি ছিলেন ফেরাউনের প্রাসাদে। আর এখন তিনি জান্নাতের বালাখানায়! জান্নাতের অপরিমেয় নাজ-নেয়ামতে পরম সুখী! অবশ্যই সঙ্গে তাঁর রয়েছে স্নেহের সন্তানেরাও!

ইমাম বুখারি (র.) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَوْ أَنَّ إِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اِطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِش لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيْحًا...وَلَنَصِيْفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا.

জান্নাতবাসী নারীদের কেউ যদি দুনিয়াতে উঁকি মারত, তাহলে সারা দুনিয়া আলোয় ভরে যেত! পূর্ণ হয়ে যেত ঘ্রাণে! ওদের মস্তকাবরণ দুনিয়া ও দুনিয়ার তাবৎ সব বস্তু থেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম।

ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেন,

مَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَايَبْؤُسُ،
لَاتَبْلَي ثِيَابُهُ، وَلَايَفْنَي شَبَابُهُ.
وَلَهُ فِي الْجَنَّةِ مَالَاعَيْنٌ رَأَتْ،

وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَخَطَرَ عَلَى قَلْبِش بَشَرٍ...وَمَنْ دَخَلَ إِلَى الْجَنَّةِ نَسِيَ عَذَابَ الدُّنْيَا.

যে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাঁর কোনো দুঃখ থাকবে না। সুখ হবে নিত্যসঙ্গী। পুরোনো হবে না পরিধেয় বস্ত্র। নিঃশেষ হবে না যৌবন। জান্নাতে থাকবে তাঁর জন্য এমন সব নেয়ামত, যা দেখেনি কোনো চোখ, কোনো দিন। যার বর্ণনা শুনেনি কোনো দিন, কোনো কান। যার কথা কল্পনায় আসেনি কোনো দিন, কোনো মানুষের! জান্নাতে প্রবেশ করা মাত্রই মানুষ ভুলে যাবে দুনিয়ার সব শাস্তির কথা!

তবে জান্নাতে যাওয়া এত সহজ নয়। জয় করতে হবে সব কু-প্রবৃত্তিকে। কারণ, জান্নাতকে ঘিরে রাখা হয়েছে কণ্টকাকীর্ণ আয়োজন দ্বারা। আর জাহান্নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে কামনা-বাসনা দ্বারা। তাই পোশাকপরিচ্ছদ বলো, আর পানাহার বলো, বা এ ধরনের আর যাই বলো, যদি তাতে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হয়, তাহলে জান্নাতের পথ কঠিন হয়ে যাবে। এবং জাহান্নামের পথ সুগম হবে। বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে,

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ...وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ.

জান্নাতকে কষ্টকর জিনিস দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছে আর জাহান্নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে প্রবৃত্তিতাড়িত কামনা-বাসনা দ্বারা।

হে নারী! হে রমণী! সত্যের পথে চলো। প্রবৃত্তিকে জয় করো! জান্নাতের পথকে সুগম করো! হোক তাতে এ দুনিয়াতে একটু কষ্ট! পরকাল তো পাচ্ছ তার বদলা! অনন্ত বদলা! সেদিন জান্নাতে প্রবেশ করার সময় ফেরেশতাদের কণ্ঠে ঘোষিত হবে,

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

ধৈর্য ধরার কারণে তোমাদের অভিবাদন। এটি কতইনা শুভ পরিণাম!

জাহান্নামিদের বলা হবে,

وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ، اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ

সেদিন কাফেরদের জাহান্নামের সন্নিকটে করা হবে। আর বলা হবে, তোমরা তো পার্থিব জীবনের সুখশান্তি ভোগ করে এসেছ। সুতরাং আজ দেওয়া হবে তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

কবরে কেন আগুন জ্বলে!

আমরা ফেরাউন-কন্যার কেশবিন্যাসকারিনীর ঘটনা পড়েছি। কী পেলাম তাতে? মিথ্যার সঙ্গে আপোষ করেননি তিনি। মাথা নত করেননি বাতিলের সামনে। সব বাধা-বিপত্তির জয় করেছেন তিনি।

অথচ বিস্ময় হয় আমাদের-ই অনেক নারীর অবস্থা দেখে। তারা বিপদাপদ ও ঝড়-ঝাপ্টায় অটল-অবিচল থাকবে; সে তো দূরের কথা, সময়মতো সালাতও আদায় করে না তারা! কখনো কখনো সালাতই দেয় ছেড়ে! কেউ কেউ দীন থেকেও অনেক দূরে সরে পড়ে! রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

আমাদের ও কাফেরদের মধ্যে পার্থক্যকারী সালাত, সুতরাং যে সালাত ছেড়ে দেয়, সে কুফুরি করে।

সালাত ছেড়ে দেওয়া ব্যক্তি জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিশিখায় অনন্তকাল জ্বলবে। তাকে শাস্তি দেওয়া হবে শয়তানের সঙ্গে। জান্নাতের নেয়ামত

থেকে সে থাকবে বঞ্চিত। পান করানো হবে তাকে জাহান্নামের টগবগে গরম পানীয়।

ইমাম জাহাবি বলেন, সালাত ছেড়ে দেওয়া 'কবিরা গুনাহ'।

একজন মহিলার কবরের ঘটনাপ্রবাহ : মৃত্যুর পর তাঁর ভাই তাঁকে দাফন করে বাড়ি ফিরে যায়। ভুলে ভাই, বোনের কবরে টাকার একটি থলে ফেলে আসে। বাড়িতে গিয়ে মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার ছুটে যায় কবরে। কবরের মাটি খুঁড়তে ছিল সে। মাটি সরাতেই দেখতে পায় কবরের ভেতর দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন! ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ভাই দ্রুত মাটিচাপা দিয়ে কবরের মুখ বন্ধ করে দেয়! দৌড়ে আসে মায়ের কাছে, ভয়ে কাঁপছে শরীর। কাঁদতে কাঁদতে বলে,

মা! আমাকে বলো তো, আমার বোন জীবদ্দশায় কী করত?

মা অবাক চোখে বলে,

হঠাৎ এমন প্রশ্ন কেন!

ছেলে বলে,

মা! আমি তার কবরে আগুন জ্বলতে দেখেছি! দাউ দাউ করে জ্বলছে!
মা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলে,

তোর বোন সালাত আদায়ে অবহেলা করত। সালাতের নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে সালাত পড়ত।

হে আমার বোনেরা!

সালাত আদায়ে অবহেলা করার পরিণাম কি তা দেখলে তো? সাবধান হয়ে যাও! খুব সতর্ক হয়ে যাও!

আমরা যে সূর্যোদয়ের পর সালাত পড়ি কিংবা অন্যান্য সালাত যে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে পড়ি; এ কিন্তু ভয়ংকর এক অপরাধ। তাহলে এখন বলো, যারা একেবারেই সালাত পড়ে না, তাদের শাস্তি কত ভয়ানক হতে পারে?

সহিহ বুখারি ও মুসলিমে আছে, আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত কাজাকারীদের শাস্তি সম্পর্কে বলেছেন,

রাতে আমার কাছে দুজন ফেরেশতা এসে আমাকে নিদ্রা থেকে তুলে বলে, চলুন! আমি তাঁদের সঙ্গে চলতে থাকি। এক জায়গায় এসে দেখতে পাই, এক ব্যক্তি শুয়ে আছে। পাশেই পাথর হাতে এক ফেরেশতা দাঁড়ানো। ফেরেশতা যখন পাথর দিয়ে তার মাথায় আঘাত করছে, তখন তা একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পাথর গিয়ে ছিটকে পড়ছে অনেক দূরে। ফেরেশতা দ্বিতীয়বার শাস্তি দিতে পাথরটা যখন পুনরায় আনতে যাচ্ছে, তার মাথাটা আবার ভালো হয়ে যাচ্ছে পূর্বের মতো। আবার সেই পাথর দিয়ে ফেরেশতা তার মাথায় করছে আঘাত। আমি বলি, এ কী? কেন এমন শাস্তি? ফেরেশতাদ্বয় আমাকে বলে, এই লোক কুরআন শিখে প্রত্যাখ্যান করত [কুরআন শিখে সে অনুযায়ী আমল করত না]। এবং সালাতের সময় সালাত না পড়ে ঘুমিয়ে থাকত।

সুরা আল কলমের ৩৩ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۚ وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

শাস্তি হবে এমনই। আখেরাতের শাস্তি সবচেয়ে বড় শাস্তি। যদি তাঁরা জানত।

রানি

সত্যি তিনি রানি ছিলেন আপন সিংহাসনে। ছিল তাঁর সাজানো পরিবার। ছিল তাঁর রাজকীয় উপায়উপকরণ ও সুবিন্যস্ত মহল। তাঁর সেবায় সদা প্রস্তুত থাকে সেবিকাদল। সশ্রদ্ধ সালাম ও কুর্ণিশে থাকেন সব সময় সম্মানিত। কিন্তু তিনি প্রাসাদ ও সম্পদের রানি-ই শুধু ছিলেন না, ছিলেন তিনি ইমানের মহা দৌলতের রানিও। তবে তাঁর ইমান ছিল গোপন। কে তিনি? তিনি ফেরাউনের স্ত্রী, বিবি আসিয়া! পালকপুত্র মুসা যখন নবী হলেন, তখন তিনি গোপনে তাঁর প্রতি ইমান আনেন।

বিবি আসিয়ার ছিল না কী? সবই ছিল। সুখ ছিল। আনন্দ ছিল। ছিল নেয়ামতে ভরপুর। কিন্তু এসবে সন্তুষ্ট ছিলেন না তিনি। যখন দেখলেন, শহিদি কাফেলা ঊর্ধ্বজগতের সফরে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি তাঁর নকল সিংহাসনের কথা ভুলে যান। আসল সিংহাসনে আরোহরণের সিদ্ধান্ত নেন। তাই প্রতিজ্ঞা করেন সবার সম্মুখে নিজের ইমানের ঘোষণা দেওয়ার এবং ব্যাকুল হয়ে পড়েন প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যাওয়ার। ফেরাউনের পরশ তাঁর আর ভালো লাগে না।

ফেরাউন যখন ইমান আনার কারণে কেশবিন্যাসকারিনী মহিলাকে হত্যা করে, তখন বিবি আসিয়া আর সইতে পারে না। ফেরাউনের কঠোর সমালোচনা শুরু করে। ইমানি শক্তিতে বলীয়ান হয়ে চিৎকার করে বলে ওঠে,

তোমার ধ্বংস হোক! কোন সাহসে তুমি আল্লাহর ওপর দুঃসাহস দেখাচ্ছ?

এরপর ফেরাউনের সামনে দাঁড়িয়ে-ই ইমানের ঘোষণা দেন তিনি। ফেরাউনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। স্ত্রীর বিরুদ্ধেও তখন জ্বলে ওঠে সে। হুঙ্কার ছেড়ে বলে,

তোমার সামনে খোলা আছে দুটি পথ। হয় আল্লাহকে অস্বীকার করবে; না হয় মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকবে!

ফেরাউন আর বিলম্ব করে না। তৎক্ষণাৎ তাঁকে একটা লোহার পাতে হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড় করানোর নির্দেশ দেয়। একটু পরই সেই লোহার পাতের সঙ্গে তাঁর হাত-পায়ে লোহার পেরেক মারা হয়। নড়চড়ের কোনো ক্ষমতা নেই। আছে শুধু দুঃসহ বেদনা। এরপর ফেরাউনের পক্ষ থেকে নির্দেশ আসে, বেত্রাঘাতের।

শুরু হয় এক নারীর ওপর এক জালিম বাদশাহর রোমহর্ষক অত্যাচার। ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে নারীদেহ। ঝরতে থাকে তাজা রক্ত। খসে পড়ে হাড্ডি থেকে গোশত।

জুলুম যখন নিষ্ঠুরতার সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়, মৃত্যু যখন অনিবার্য হয়ে ওঠে, তখন মহীয়সী নারী আসিয়া তাকালেন আকাশের দিকে। বললেন, বিড়বিড় করে,

رَبِّ ابْنِ لِیْ عِنْدَكَ بَیْتًا فِی الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِیْ مِنَ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهٖ وَ نَجِّنِیْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ

হে আমার রব! তোমার পরশে আমার জন্য একটি গৃহ সাজাও।

আমাকে মুক্ত করো ফেরাউন এবং তার দুষ্কর্মের হাত থেকে। আমাকে মুক্তি দাও এ অত্যাচারীসম্প্রদায় থেকে। [সুরা তাহরিম : ১১]

এমন বেদনাঘেরা হৃদয়ের প্রার্থনা...জালিমকর্তৃক দলিতমথিত এমন হৃদয়ের প্রার্থনা কি কবুল না হয়ে পারে? সরাসরি আল্লাহর আরশ স্পর্শ করে তাঁর এ প্রার্থনা! প্রখ্যাত তাফসিরকারক আল্লামা ইবনে কাসির (র.) বলেন,

আল্লাহু আকবার! আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রার্থনা কবুল করে নেন এবং জান্নাতে নির্মিত হওয়া সেই বাড়িও তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরেন! তা দেখার পর বিবি আসিয়ার চোখে-মুখে মিষ্টি হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে পড়ে। আর তিনি চলে যান মহান আল্লাহর দরবারে।

হ্যাঁ, রানি চলে গেছেন! শাহাদতের লালসমুদ্র পাড়ি দিয়ে হাসতে হাসতে! দুনিয়ায় বসেই জান্নাতের ঠিকানা যার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাতে কে না হয় মাতোয়ারা? ফেরাউনরূপী জালিমদের জুলুমদণ্ডকে তখন আর মনে হয় না দণ্ড। মনে হয় শুধু গোলাপের কোমল আঁচড়! আর পার্থিব সুখকেও সুখ মনে হয় না, মনে হয় পথের কাঁটা!

সবই ছেড়ে চলে গেছেন তিনি। তাঁর ফুলে ফুলে সুরভিত উদ্যান, সেবিকাদের কোলাহলময় আনাগোনা, সুখীবান্ধবীদের সরু চোখের আঁচলচাপা, হাস্যোজ্জ্বল-কৌতুক, সব ছেড়ে মৃত্যুকে বেছে নিলেন। গৌরবের মৃত্যুকে। আরে, শহিদি মৃত্যু তো গৌরবেরই হয়ে থাকে!

আজ সুখের মাঝে তাঁর নিত্যবাস। সে সুখের হয় না কোনো তুলনা । আরে, জান্নাতি সুখ কী হতে পারে কোনো সময় তুলনীয়? আল্লাহর

পথে জীবন বিলিয়ে দিলে এমন পুরস্কারই মিলে! তখন দুনিয়ায় বসেই দেখা যায়, জান্নাতের অপরূপ ছায়া! জান্নাতের কোথায় হবে আপন ঠিকানা, তাও তখন এ দুনিয়াতে বসেই করা যায় প্রত্যক্ষ!

ধন্য তুমি হে মহীয়সী! ধন্য তোমার জীবনদান!

প্রবৃত্তিকে জয় করে আখেরাতের বাগান সাজানোর যে শিক্ষা তুমি দিয়ে গেলে নারী জাতিকে... তা গ্রহণ করবে কি বর্তমানযুগের নারীজাতি?

ইয়াকুতখচিত মোতির বাড়ি!

রানি আসিয়া আর নেই! কিন্তু তাঁর আদর্শ নারী জাতিকে আলোকিত করে যাচ্ছে ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে। আমরা এখন আরেক মহীয়সীর কাছে নিয়ে যাব তোমাকে। যদি রানি আসিয়া থেকে তুমি শিক্ষা নাও, তাহলে তোমার জন্য এখানেও আছে অনেক শিক্ষা–

ইমাম বুখারি (র.)-এর ভাষ্য মতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত প্রাপ্তির কিছুকাল পূর্ব থেকে হেরাগুহায় যাওয়া-আসা করতেন। সেখানে তিনি মগ্ন থাকতেন আল্লাহর ইবাদতে। ধ্যান করতেন আল্লাহর। একদিন ধ্যানে থাকার পর তিনি কিছুটা ক্লান্তি অনুভব করেন। হাতটা মাথার নিচে দিয়ে শুয়ে পড়েন। তিনি শুয়ে থাকেন গুহার নীরব শান্ত পরিবেশে। হঠাৎ হেরাগুহায় তাঁর কাছে আগমন করে স্বর্গীয় দূত জিবরাইল (আ.)। এসে বলেন,

পড়ুন!

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীতকণ্ঠে জবাব দেন,

আমি পড়তে পারি না, লিখতে পারি না।

জিবরাইল তখন তাঁকে বুকে মেশান। মৃদুচাপ
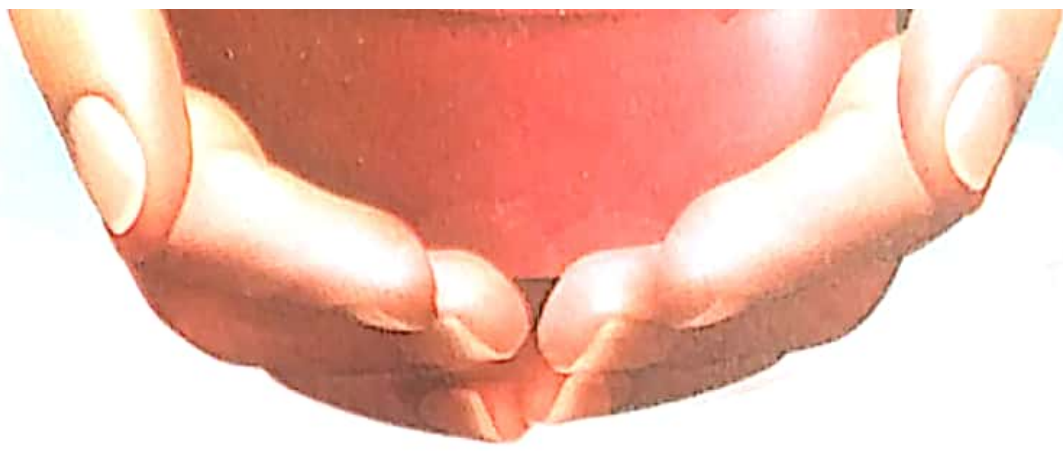
দেন। ছেড়ে দিয়ে বলেন,

এবার পড়ুন!

নবীজি পেরেশান হয়ে বলেন,

কী পড়ব? আমি তো পড়তে পারি না।

আবার জিবরাইল তাঁকে ধরে চাপ দেন। এবার আরও জোরে। আবার শোনা গেল জিবরাইলের কণ্ঠে,

পড়ুন!

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই কথা আবার বললেন,

কী পড়ব আমি?

এবার কোনো চাপ নয়। স্বাভাবিকভাবেই উচ্চারিত হয় আসমানি দূতের কণ্ঠে—

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাকে। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবাঁধা রক্ত [আঁঠালো বস্তু] থেকে। পড়, তোমার প্রভু বড় দয়ালু। যিনি মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন কলমের সাহায্যে। মানুষকে জানিয়েছেন, যা তাঁরা জানত না ইতঃপূর্বে।

[সুরা আলাক : ১-৫]

এ আয়াতগুলো শুনে আর এ দৃশ্য দেখে নবীজির ভয় আরও বেড়ে যায়। থরথর করে কাঁপতে থাকে শরীর। ছুটে আসেন আপন গৃহে। খাদিজার কাছে। এসেই সঙ্গে সঙ্গে বলেন, খাদিজা! আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে দ্রুত চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেই শুয়ে পড়েন। হজরত খাদিজা (রা.) তাঁকে দ্রুত ঢেকে দেন। খাদিজা খুব চিন্তায় পড়ে যান। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

কিছুক্ষণ পর যখন আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভয় কিছুটা দূর হয় এবং তিনি শান্ত হন, তখন তিনি খাদিজা (রা.) কে সব ঘটনা খুলে বলেন। আরও বলেন, খাদিজা! আমার খুব ভয় লাগছে নিজের ব্যাপারে।

খাদিজা (রা.) তখন দৃঢ় কণ্ঠে রসুল (সা.) কে সান্ত্বনা দেন এভাবে,
كَلَّا...وَاللهِ لَايُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا...إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ...وَتَقْرِيْ الضَّيْفَ...وَتَحْمِلُ الْكَلَّ...وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ...وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ.

আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি! আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না আল্লাহ কখনো। আপনি তো সদা সত্য কথা বলেন। আত্মীয়দের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখেন। বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করেন।

খাদিজা (রা.)-র সান্ত্বনা ও সাহসী ভূমিকা তাঁর থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি। সব সময় তিনি নবীজির পাশে ছিলেন ছায়ার মতো। সান্ত্বনার দরকার হয়েছে, সান্ত্বনা দিয়েছেন। সহযোগিতার দরকার হয়েছে, সহযোগিতা করেছেন। এমনকি নিজের সামর্থ্যের সবকিছুই নবীর তরে বিলিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহর রসুল একটু অপ্রকৃতিস্থ হতেই হাত ধরে তিনি তাঁকে নিয়ে

যান চাচাতো ভাই ওরাকা বিন নওফেলের কাছে। তখন ওরাকার বয়স হয়ে গিয়েছিল অনেক। দৃষ্টিশক্তিও লোপ পেয়ে গিয়েছিল। জাহেলি যুগে তিনি ইসা আলাইহিস সালামের ধর্মের ওপর ছিলেন অটল। তিনি ইঞ্জিলের বোদ্ধা পাঠক ছিলেন। পূর্ববর্তী অনেক নবী-রসুলের কথা জানতেন এই ইঞ্জিলের মাধ্যমে।

খাদিজা (রা.) আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন,

يَاابْنَ عَمِّ! اِسْمَعْ مِنْ اِبْنِ أَخِيكَ...

হে চাচাতো ভাই! শুনুন আপনার ভাতিজা কী বলে এসব?

ওরাকা তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন,

ভাতিজা! কী দেখেছ তুমি?

তখন আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরাগুহায় যা দেখেছেন এবং যা শুনেছেন, একে একে সব খুলে খুলে বললেন। সব শুনে ওরাকা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন। এবং বলেন,

মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো! আবার বলছি, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো! ইনিই সেই নামুস, যিনি মুসা আলাইহিস সালামের কাছেও আসতেন!

এরপর ওরাকা কিছুক্ষণ নীরব থেকে আক্ষেপ করে বলেন,

হায়! যেদিন তোমার কওম তোমাকে বের করে দেবে, সেদিন যদি আমি জীবিত থাকতাম, তাহলে তোমার জন্য আমি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতাম!

কী বলছেন! আমার কওম আমাকে বের করে দেবে?

ওরাকা বললেন, হ্যাঁ, তোমার কাছে আল্লাহর যে বাণী এসেছে, এ বাণী যাঁর কাছেই আসে তাঁর সঙ্গেই এমন আচরণ করা হয়।

এরপর আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম খাদিজা (রা.)-র সঙ্গে বেরিয়ে যান। হজরত খাদিজা (রা.) নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারেন যে, আরামের দিন শেষ। অচিরেই তাঁকেও স্বামীর সঙ্গে কষ্ট শিকারের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। হতে হবে গৃহছাড়া। সইতে হবে জুলুম-নিপীড়ন।

ধনবতী বংশোদ্ভূত হয়েও খাদিজাকে আজ এমন করে ভাবতে হচ্ছে। বিস্তৃত পরিসরে ছড়ানো ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিক হয়েও তাঁকে আজ ভাবতে হচ্ছে, ত্যাগের কথা, কুরবানির কথা, সত্যের পথে কষ্টক্লেশ সহ্য করার কথা।

যদি আসে সেই কঠিন দিন, আর তা তো আসবেই, তাহলে কি তিনি দীনের সাহায্যে পিছপা হয়ে যাবেন? তাঁর ইমান ও ইয়াকিনে কি চিড় ধরবে? হতেই পারে না। অসম্ভব। তিনি তো ইমান এনেছেন তাঁর রব-এর যে কোনো দাবি পূরণের জন্যই! আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়য়াসাল্লামকে জান দিয়ে, মাল দিয়ে, চেষ্টা দিয়ে সহযোগিতা করার জন্যই!

এ ছিল হজরত খাদিজার চিন্তাভাবনা ও ধ্যানজ্ঞান মৃত্যুপর্যন্ত।

সহিহ মুসলিম শরিফে আছে,

আল্লাহর নবীর কাছে জিবরাইল (আ.) আগমন করেন। এবং নবীজিকে বলেন,

হে আল্লাহর রসুল! এই যে খাদিজা আসছেন, একটা পাত্র নিয়ে, যাতে আছে তরকারি, খাবার এবং পানীয়। তিনি আপনার কাছে আসলেই আপনি তাঁকে তাঁর রব-এর পক্ষ থেকে সালাম বলবেন। আমার পক্ষ থেকেও সালাম বলবেন। আর তাঁকে সুসংবাদ দিবেন যে, জান্নাতে তাঁর জন্য থাকবে একটি ইয়াকুতখচিত মোতির বাড়ি! যেখানে থাকবে না কোনো কোলাহল কিংবা ক্লান্তিবোধ।

এতক্ষণ তুমি বিবি খাদিজার কথা শুনলে। মূর্তিপূজা প্রত্যাখ্যান করে সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন কে? তিনি বিবি খাদিজা। ইতিহাস শুধু তাঁর জন্যই এ আসনটি সংরক্ষণ করে রেখেছে। এ ক্ষেত্রে পুরুষেরা তাঁর পেছনে। বীর, মহাবীরেরাও তাঁর পেছনে। ইতিহাসকে আলোকিত করে রেখেছে তাঁর ত্যাগ ও কুরবানির কাহিনি। মক্কার কাফেরদের অমানবিক অবরোধ করা আবু তালেবের ঘাঁটির ভেতর মহীয়সী খাদিজাও আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলেন। আর সেখানকার যে কষ্ট ও ক্লেশের কথা ইতিহাসে লেখা আছে, তা পড়লে চোখে শুধু পানি নয়, রক্ত এসে যায়। বিবি খাদিজা অম্লান বদনে মেনে নিয়েছেন অবরোধকালীন সময়ের সকল কষ্টক্লেশ। আল্লাহর পথে যেকোনো কষ্ট স্বীকারে তিনি ছিলেন সদাপ্রস্তুত। কোনো মানুষ তাঁকে অপমান করবে, এ ভয় তাঁকে শঙ্কিত করেনি। কোনো পাপাচারী তাঁর চরিত্রে কালিমা লেপনের চেষ্টা করবে, এ ভয়ও তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছাতে পারেনি।

ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিনিময়ও লাভ করেন তিনি অপরিমেয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে জান্নাতের অফুরন্ত মেহমানদারি ও আতিথেয়তার। আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে তাঁর কাছে সালাম ও সুসংবাদ। জান্নাতি বাড়ি নির্মাণের ঘোষণা!

এমন প্রাপ্তিতে আপ্লুত না হয় কে?

এমন সুসংবাদের পর তাঁর শোকর ও ইবাদত আরও বেড়ে গেছে। ইমানের সকল স্তর পার হয়ে তিনি পৌঁছে গেছেন পরিপূর্ণতার ঘরে। ইমানের কামেল মারহালায়। আল্লাহর কাছে চলে না যাওয়া পর্যন্ত চলে তাঁর এ

সাধানা পূর্ণমহিমায়। আল্লাহ যখন তাঁকে ডেকে নেন, তখন তাঁর বিরহবিচ্ছেদ শুধু উম্মতকে কাঁদায়নি, শুধু আকাশ-পৃথিবীকে কাঁদায়নি, কাঁদিয়েছে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও। তাই তাঁর ওফাতের বছর ছিল তাঁর কাছে শোকের বছর।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٧٢﴾

আল্লাহ মুমিন নর-নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের, যার তলদেশে প্রবাহিত হবে ঝরনাধরা। যেখানে তাঁরা হবে চিরস্থায়ী এবং তাঁরা জান্নাতের উত্তম আবাসস্থলে বসবাস করবে। আল্ল[illegible] সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সেটাই বড় সাফল্য। *[সুরা তওবা : ৭২]*

অবশ্যই মহান আল্লাহ আমাদের আম্মাজান খাদিজা (রা.) কেও দেবেন এ মর্যাদা। কেননা, তিনি তো তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তাহলে তাঁর মেয়েরা কেন তাঁর অনুসরণ করে ধন্য হবে না এই প্রাপ্তির!

হে আমার বোন!

কেন তুমি তাঁর আনুগত্যকে নিজের গর্ব ও অহঙ্কারের বস্তু মনে করবে না? তুমি কি চাও না? তোমার জন্যও তৈরি হোক একটা জান্নাতে বাগানবাড়ি? ইয়াকুতখচিত একটা মুক্তার বাড়ি? যেখানে থাকবে না কোনো বিরক্তিকর কোলাহল ও ক্লান্তি-অবসাদ? তাহলে খাদিজার জীবনাদর্শকেই নিজের জীবনাদর্শ বানাও তুমি। তাঁর প্রেমকেই নবীপ্রেম বানাও তুমি। তাঁর আদর্শের পথে চলাকেই কণ্ঠাহার বানাও তুমি।
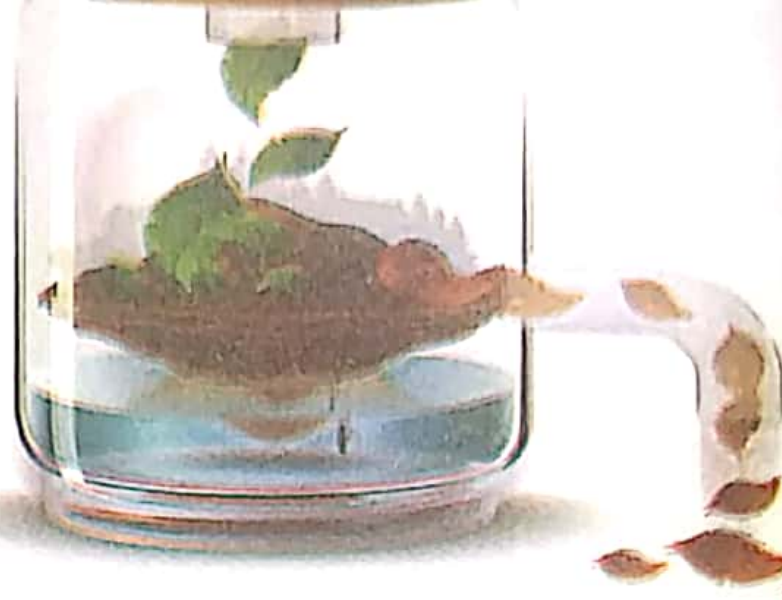
সর্বশেষ আঘাত!

'উম্মে আম্মার সুমাইয়া' ছিলেন আবু জেহেলের অধিনস্ত এক দাসী। ইসলামের দাওয়াত তাঁর কাছে পৌঁছার পর সে ও তাঁর ছেলে এবং স্বামী ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হয়ে ধন্য হয়। যখন আবু জেহেল তাঁদের ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারে, তখন তাঁদের ওপর নেমে আসে রোমহর্ষক শাস্তি।

বেঁধে রাখা হয় তাঁদের প্রচণ্ড সূর্যতাপে! তারপর চলে বেত্রাঘাত! গরমের প্রচণ্ডতায় এবং পিপাসার তীব্রতায় প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছে তাঁদের!

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের পাশ দিয়ে যেতেন আর দেখতেন তাঁদের শরীর থেকে টপটপ করে রক্ত ঝরছে। গরমে পিপাসায় তাঁরা ছটফট করছে। নির্দয়-নিষ্ঠুর বেত্রাঘাতের কারণে শরীরের ক্ষতগুলো দগদগ করছে।

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব দেখতেন আর ব্যথিত হতেন। তাঁদের সুসংবাদ শুনিয়ে বলতেন,

صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ...صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ...فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ اَلْجَنَّةَ.

হে ইয়াসির পরিবার, ধৈর্য ধরো! হে ইয়াসির পরিবার, ধৈর্য ধরো! নিশ্চয় তোমাদের ঠিকানা জান্নাত।

স্বয়ং আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে এমন সুসংবাদ শুনে ইয়াসির পরিবারের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। ভুলে যায় রক্তাক্ত দেহের কথা। নিষ্ঠুর জল্লাদের বেত্রাঘাতের কথা।

হঠাৎ সেখানে আসে আবু জেহেল। আজ ইয়াসির পরিবারের ওপর আরও বেশি ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত শয়তানটা। আরও বাড়িয়ে দেয় শাস্তি ও জুলুমের মাত্রা। বলে,

মুহাম্মাদকে গালি দাও, দিতেই হবে। তা না হয় তোমাদের ওপর অনবরত শাস্তি জারি থাকবে। কিন্তু ইয়াসির পরিবার ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে নরাধম আবু জেহেলের কথা। তাঁদের ইমান আরও বেড়ে যায়।

শয়তানটা একপর্যায় এগিয়ে যায় সুমাইয়া (রা.)-র দিকে। আস্তে আস্তে বের করে বর্শা। হঠাৎ ছুঁড়ে মারে বিবি সুমাইয়ার লজ্জাস্থানে! বয়ে যায় তাজা রক্তের দরিয়া! সুমাইয়ার চিৎকারে কেঁপে ওঠে মক্কার আকাশ-বাতাস।! স্বামী, ছেলে আছে তাঁর পাশেই; কিন্তু কিছুই করার ছিল না তাঁদের। তাঁরা যে বন্দী! হাত পা তাঁদের বাঁধা। তাই নীরবেই তাঁদের দেখতে হয় নারীর প্রতি এক নরপশুর নিষ্ঠুর বর্বরতা! আবু জেহেল তাঁকে গালি দেয়। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিতে বলে। আর বিবি সুমাইয়া রক্তেভেজা দেহে মৃত্যুর প্রহর গুনতে গুনতে বলে, আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! এক সময় বর্শাঘাতে রক্তক্ষরণে নিস্তেজ হয়ে যায় দেহ। নিকটবর্তী হয়ে আসে শাহাদাতের কাঙ্ক্ষিত লগ্ন! লুটিয়ে পড়ে শহিদদের লাল বিছানায়!

হ্যাঁ, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

কিন্তু কি সুন্দর তাঁর মৃত্যু!

মৃত্যুকে যখন আলিঙ্গন করেন তিনি, তখন তাঁর রব তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা, তিনি ছিলেন দীনের ওপর অবিচল। তিনি

মৃত্যুর কোলে বসে বসে হেসেছেন, তবুও পরোয়া করেননি জল্লাদের চাবুক। কাফের নেতাদের কোনো প্রলোভন পারেনি তাঁর ইমানের কুসুম-কাননে আবর্জনা ফেলতে।

কিন্তু বেদনায় নীল হয়ে যেতে হয়, যখন দেখি; বর্তমান যুগের তরুণী ও যুবতীরা অল্পতেই পথ হারিয়ে বসে। সামান্য থেকে সামান্য প্রলোভনের জালে আটকা পড়েই বিকিয়ে দেয় নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ইমান-আকিদা। অথচ জুলুম-নির্যাতনও তাদের সইতে হয় না। দুশমনের চাবুকের আঘাতেও তাদের শরীর ক্ষতবিক্ষত হয় না। কোনো ভয়-ভীতিও তাদের তাড়া করে না। নেই তাদের জীবনে বিবি হাজেরা, বিবি আসিয়া ও বিবি সুমাইয়ার ত্যাগ, কষ্ট ও লাঞ্চনা।

তবুও তারা কেন দীন থেকে সরে যায়?

কেন গান শুনে কলুষিত করে নিজেদের?

সিনেমা-নাটক দেখে কেন নষ্ট করে জীবন?

প্রেম-ভালোবাসার নামে কেন ছুটে প্রবৃত্তির পেছন পেছন? একদল মাতাল ও বিকারগ্রস্ত মানুষের যৌন পিপাসার ক্ষুধা মিটাতে কেন শরিয়তের অলঙ্ঘনীয় বিধান হিজাব ও পর্দাকে করে অপদস্থ?

আকাশ তোমায় পান করাবে!

হ্যাঁ, সোনালি অতীতে আমাদের গর্বিত নারী জাতি অন্যায় ও অসত্যের সামনে কখনো আপোষ করেনি।

তাঁরা জান দিয়েছে তবু মান দেয়নি। রক্ত দিয়েছে তবু বেইমান হয়নি। নির্যাতন ভোগ করেছে তবু নতি স্বীকার করেনি। তপ্ত লৌহশলাকার

ছ্যাঁকা সয়েছে, স্বামী-পুত্রের বিচ্ছেদ মেনে নিয়েছে, তবু পবিত্র বিশ্বাস থেকে চুল পরিমাণও সরে যায়নি।

আল্লাহ আমার রব! এ উচ্চারণে সদা মুখর ও সজীব ছিল তাঁদের কণ্ঠ। যখন এসেছে চ্যালেঞ্জ পর্দার ব্যাপারে, তখন নির্ভীক কণ্ঠে বলেছে, না। পর্দা আমি ছাড়ব না। পর্দা আমার অহঙ্কার। পর্দা আমার ভূষণ।

যখন বিপদ এসেছে ইজ্জত-আব্রুর ওপর, তখন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন, জান দেবো তবু মান দেবো না।

যখন ডাক এসেছে আল্লাহর রাহে জীবন বিলিয়ে দেওয়ার, তখন তাঁদের বলতে শোনা গেছে,

আমার জীবন তো আমার না। এ জীবনের বিনিময়ে না, আমি আল্লাহর কাছ থেকে খরিদ করেছি জান্নাত!

এঁরা নারী জাতির চিরগর্ভ, চিরঅহঙ্কার, চিরস্মরণীয়। জীবন কেটেছে তাঁদের একই ধ্যানজ্ঞানে, কীভাবে করবেন ইসলামের খেদমত, কীভাবে বিলিয়ে দেবেন দীনের তরে সব ধনসম্পদ!

যখনই তাঁদের কাছে এসেছে সত্যের আহ্বান, লাব্বাইক বলতে তাঁরা একটুও বিলম্ব করেননি! তারপর? তারপর তাঁরা সত্যের রঙে রাঙাতে এবং ইমান ও ইয়াকিনকে প্রতিষ্ঠা করতে নিজেদের ব্যস্ত রাখতেন সব সময়।

ইতিহাসের এমন আলোকিত নারীদের কথা এক এক করে আর বলা যায় কত? না বলেও কী শেষ করা যায়? সবাই তো তাঁরা ছিলেন ওই আকাশের রবি–শশী-গ্রহ-তারা? শোনো আরেকজনের কাহিনি–

কে তিনি? তিনি উম্মে শোরাইক। ইসলামের সূচনাকালেই ইসলাম কবুল করেন। নিরাপদ নগরী মক্কায় অবস্থান করেন। যখন দেখেন কাফেরদের দাপট ও দৌরাত্ম্য আর মুসলমানদের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব, তখন তিনি আর ঘরে বসে থাকতে পারেন না। দাওয়াতের গুরুভার তুলে নেন নিজের কাঁধে। ইমানকে করেন মজবুত, সুদৃঢ়। তাঁর রব-এর মর্যাদা তাঁর কাছে হয়ে ওঠে সকল কেন্দ্রের কেন্দ্রবিন্দু। সকল নদীর মোহনা।

গোপনে গোপনে কোরাইশি মহিলাদের কাছে গিয়ে তাঁদের দীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। মূর্তিপূজার অসারতা তুলে ধরেন তাঁদের সামনে। কিন্তু তাঁর গোপন দাওাতের কথা বেশিদিন গোপন থাকেনি। জেনে যায় কোরাইশ বংশের কাফেররা। ফলে জ্বলে ওঠে ওদের নাপাক প্রেতাত্মা। উম্মে শোরাইক কোরাইশ গোত্রের মহিলা ছিলেন না। তাই তাঁর পাশে কোরাইশ বংশের কেউ এসে দাঁড়ায়নি। কোরাইশরা তাঁকে ধরে এনে গলার রগ টান করে বলে,

তোমার সম্প্রদায় যদি আমাদের মিত্র না হতো, তাহলে আমরা তোমার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম। কিন্তু তোমাকে একেবারে ছেড়ে দেবো না আমরা। অন্যায় তোমার গুরুতর। তোমাকে মক্কা থেকে বের করে দিব আমরা। তোমাকে ফিরে যেতে হবে স্বজাতির কাছে। মক্কায় তোমার কোনো ঠাঁই নেই।

এরপর তারা একটা উটের পিঠে তাঁকে তুলে দেয়। জিনবিহীন উট। উটের পিঠে সামান্য কাপড় বিছানোরও অনুমতি দেয় না তারা। এমন জিনহীন খালি পিঠে সফর করাটা কত যে কঠিন, তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ জানে না। এমন আচরণ করেছে মূলত তাঁকে শাস্তি দিতে। মহিলা হয়েও তিনি ওদের কাছে সামান্যতম এ মানবিক করুনাটুকুও পেলেন না।

যা হোক, শুরু হয় উটের মরুসফর।
তিন দিন তারা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে

পথ চলতে থাকে। এ তিন দিনে সফরসঙ্গীরা তাঁকে কিছুই খেতে দেয় না। একফোঁটা পানিও না। ক্ষুধা ও পিপাসায় তাঁর প্রাণ যায় যায় অবস্থা। কাফেররা যখন কোনো লোকালয়ে যাত্রাবিরতি করত, তখন উম্মে শোরাইককে বেঁধে রাখত। ছায়ার বদলে প্রখর রৌদ্রে ফেলে রাখত। আর নিজেরা শীতল ছায়ায় বসত। ছায়াদার বৃক্ষের নীচে বসত।

একদিন তারা এক বাড়ির কাছে যাত্রাবিরতি করে। উম্মে শোরাইককে উট থেকে নামায়। বেঁধে রাখে রৌদ্রে। উম্মে শোরাইক চায় একটু পানি। কিন্তু তারা না করে দেয়। বেসামাল ক্ষুধা ও পিপাসা নিবারণের কোনো উপায় দেখে না। অস্থির হয়ে চাটতে থাকে জিহ্বা। হঠাৎ অনুভব করে বুকের কাছটায় ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। হাত দিয়ে দেখেন, পানিভরা একটা ছোট্ট বালতি সেখানে। অবাক-বিস্ময়ে তিনি সেখান থেকে আঁজলাভরে পানি নিলেন। তৃপ্তিভরে পান করলেন। আবার নিলেন, আবার পান করলেন। হলেন তৃপ্ত। কি শীতল পানি! কি তার স্বাদ ও মিষ্টতা! কি তার মজা ও মধুরতা! তাঁর ভেতরটা একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে। এবার তিনি বাকি পানিটুকু ঢেলে দিলেন শরীরে। আহা! কি শান্তি! যেন জান্নাতি ঝর্ণা থেকে এইমাত্র তিনি নেয়ে এসেছেন!

এদিকে কাফেররা বিশ্রাম শেষে নতুন করে পথচলার জন্য বিশ্রাম থেকে ওঠে তাঁর কাছে আসে। এসে দেখে তাঁর শরীর ও পরিধেয় পোশাক পানিতে ভেজা। তাঁকেও দেখে মনে হয় ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন ও হৃষ্টপুষ্ট! তারা বেশ অবাক হয়। কি করে এল পানি এর কাছে? কে দিয়ে গেছে? সে তো বন্দী! তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করে,

এই ঠিক করে বলো তো, তুমি বাঁধন খুলে আমাদের পানি এনে শেষ করে দাওনি তো!

উম্মে শোরাইক বলেন,

না! কসম আল্লার! তবে আকাশ থেকে পানিভরা একটা বালতি নেমে এসেছে আমার কাছে।

আমি তা থেকে-ই পান করে তৃপ্ত হয়েছি। আর বাকিটা ঢেলে দিয়েছি শরীরে।

তাঁর কথা শুনে কাফেরদের চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠে। তারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। আর বলে,

যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে তাঁর দীন-ই তো দেখছি সঠিক!

এরপর তারা দেখে, তাদের মশক ঠিক যেমন ছিল তেমনই আছে। কেউ স্পর্শ করেনি তাদের মশক। তারা নিশ্চিত হয় যে, উম্মে শোরাইক যা বলছে শতভাগ সত্যিই বলছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা তাঁর কাছে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ তারা খুলে দেয় উম্মে শোরাইকের সব বাঁধন। নিমিষেই বদলে যায় সবাই। কঠিন হৃদয়ের প্রহরিরা পরিণত হয় দয়ালু ও অনুগত খাদেমে! এরপর থেকে তারা তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার শুরু করে।

একটু আগে যিনি দিয়েছেন তাদের আলোর পথের সন্ধান, সত্যপথের দিশা, তাঁর হাতে কি এখন আর শেকল মানায়?

পথসঙ্গী সবাই ইসলাম কবুল করে; তাঁর ধৈর্য ও অবিচলতার কারণে। হ্যাঁ, কেয়ামতের দিন যখন উম্মে শোরাইক শান্তির ঘুম থেকে উঠবেন, তখন তাঁর হাতের সহিফায় [তালিকায়] থাকবে এমন কিছু নারী-পুরুষের নাম, যাঁরা তাঁর হাতে ইসলাম কবুল করে হয়েছেন ধন্য। হাশরের ময়দানে তো এটাও এক বিরাট পাওয়া। আছে কি কোনো বোন উম্মে শোরাইকের এ কাহিনি ও ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হওয়ার?

জান্নাতি মহিলাকে দেখতে চাও তোমরা!

হ্যাঁ, ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে উম্মে শোরাইকের কথা! ইতিহাসে আরও এমন অনেক মহীয়সী নারীর কথা লেখা আছে! তাঁদের আরেকজন হলেন, গোমাইসা। আনাস ইবনে মালেক (রা.)-র জননী। যাঁর সম্পর্কে আল্লাহর নবী ইরশাদ করেন,

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً بَيْنَ يَدَيَّ فَإِذَا هِيَ الْغُمَيْصَاءُ بِنْتِ مَلْحَانَ...

আমি জান্নাতে প্রবেশ করে শুনতে পেলাম, আমার সামনে একটা খসখসানি শব্দ হচ্ছে। চাইতে-ই দেখি, আরে! এ যে গোমাইসা বিনতে মালহান!

বিস্ময়কর এক মহিলা তিনি। জাহেলি যুগে অন্য যুবতীদের মতোই তাঁর জীবন কেটেছে। মালিক ইবনে নজরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছে। ইসলামের আগমনের পর আনসারদের একটি প্রতিনিধি দল ইসলাম কবুল করেন। তাঁর কুনিয়াত [উপনাম] ছিল উম্মে সোলাইম। উম্মে সোলাইম ইসলাম গ্রহণের পর স্বামীকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু স্বামী দাওয়াত কবুল না করে উল্টো স্ত্রীর ওপর রুষ্ট হয়ে শাম চলে যাওয়ার মনস্থীর করেন। তাঁর সঙ্গে উম্মে সোলাইমকেও নিয়ে যেতে চাইলেন। উম্মে সোলাইম রাজি হলেন না। অগত্যা তিনি একাই শাম চলে যান। এবং সেখানেই কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করেন।

উম্মে সোলাইম ছিলেন একজন রূপবতী ও বুদ্ধিমতী মহিলা। তাই তাঁকে

বিবাহ করার জন্য পুরুষদের মাঝে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়। আবু তলহাও কিন্তু বিবাহের পয়গাম পাঠান। তবে তখনো তিনি ইসলাম কবুল করেননি। উম্মে সোলাইম আবু তলহার পয়গাম ফিরিয়ে দেননি, কিন্তু কিছু শর্ত দিয়ে দেন। বলেন,

আবু তলহা, আমি রাজি। তোমার মতো মানুষের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিই কীভাবে আমি? তবে আমি মুসলমান, আর তুমি কাফের। তুমি ইসলাম কবুল করলেই কেবল এই বিবাহ হতে পারে। হ্যাঁ, আমাকে তবে তোমার কোনো মোহর দিতে হবে না। তোমার ইসলাম গ্রহণকেই আমি মোহর হিসেবে ধরে নিব।

আবু তলহা বললেন,

কিন্তু আমিও তো একটি ধর্মের অনুসারী!

উম্মে সোলাইম জবাবে বললেন,

দেখ, আবু তলহা! তুমি একটি ধর্মের অনুসারী ঠিক আছে। কিন্তু তুমি বাতিল ধর্মের অনুসারী। তোমার উপাস্য কি কাঠের নিষ্প্রাণ টুকরো ছাড়া আর কিছু? যা কেটে কেটে তৈরি করেছে হাবশি এক গোলাম!

আবু তলহা উম্মে সোলাইমের কথা অস্বীকার করতে পারে না। কেননা তাঁর কথায় যুক্তি ছিল, বুদ্ধি ছিল। বলেন,

হ্যাঁ, ঠিক আছে, তুমি ঠিক-ই ধরেছ।

উম্মে সোলাইম এবার আবু তলহাকে নাগালের ভেতর পেয়ে যান। বলেন, আবু তলহা! তোমার বিবেকে কি কোনো প্রশ্ন জাগে না? এমন নিষ্প্রাণ কাঠখণ্ডকে নিজের উপাস্য বানাতে? শোনো, তুমি ইসলাম কবুল করলেই

বিবাহ হবে এবং মোহর ছাড়াই আমি এ বিবাহে রাজি হবো। আবারও বলছি, তোমার ইসলাম গ্রহণই তোমার পক্ষ থেকে আমার জন্য মোহর ধরা হবে।

আবু তলহা উম্মে সোলাইমের এমন যুক্তিযুক্ত কথা শুনে লা-জওয়াব হয়ে যান। আর বলেন, আচ্ছা আমি একটু ভেবে দেখি।

আবু তলহা এই বলে চলে যান। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসুল।

এ ঘোষণায় উম্মে সোলাইম ভীষণ খুশি হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন, হে আনাস! আমাকে আবু তলহার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দাও। [হজরত আনাস (রা.)-র মা ছিলেন উম্মে সোলাইম। মালেক ইবনে নজর ছিলেন, তাঁর পিতা।]

এরপর আবু তলহার সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায়। দুজনেই এখন খুশি।

তবে উম্মে সোলাইমের এ খুশি যতটা না বিবাহ সম্পন্ন হওয়ায়, তার চেয়ে অনেক বেশি আবু তলহার ইমান নসিব হওয়ায়! আবু তলহার ইমানের বদৌলতে নিজের অধিকার ছেড়ে দেন উম্মে সোলাইম। ইসলামের ঘোষিত ব্যক্তিস্বার্থকে ছেড়ে দেন দীনিস্বার্থে!

দেখো, এ পার্থিব জগতে উম্মে সোলাইমের মোহরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মোহর আর কী হতে পারে? হ্যাঁ, ইসলাম তাঁর মোহর! টাকা নয়, পয়সা নয়, সোনা নয়; বরং ইসলামই তাঁর মোহর! এমন সৌভাগ্য কজনের হয়?

শুধু ইসলামের জন্য নিজের অধিকার ছেড়ে দেন তিনি। শুধু ইসলামের স্বার্থে নিজেকে নামিয়ে আনেন মোহরহীন এক 'সস্তা' বধূতে। হে নারী! তোমার জন্য এখানে আছে অনেক শিক্ষা।

হ্যাঁ, উম্মে সোলাইম এমন এক মহীয়সী নারী ছিলেন, যাঁর একমাত্র ব্রত ছিল ইসলাম ও ইসলামের নবীর খেদমত করা। ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধিকে তিনি মনে করতেন নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি। শোনো, তাঁর কুরবানির আরেক কাহিনি—

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন আনসাররা আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.)-র বাড়িতে অবতরণের পর দলে দলে সাহাবায়েকেরাম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সমবেত হতে থাকে। অন্য সবার মতো তিনিও তাঁর সাক্ষাৎ লাভের জন্য লালায়িত হন। একদিন উম্মে সোলাইম সবার সঙ্গে বের হন নবীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তাঁর খেদমতে কিছু পেশ করতে। সে সুযোগ যখন এল, তখন তিনি তাঁর খেদমতে পেশ করার মতো নিজের কলিজার টুকরো ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পান না। কলিজার টুকরো তো আর কেউ নন, তিনি ছিলেন ছেলে আনাস (রা.)। তাঁকে এগিয়ে দেন আল্লাহর নবীর দিকে। আর বলেন,

হে আল্লাহর রসুল! আমার ছেলে আনাস, এখন থেকে সব সময় আপনার

খেদমতে থাকবে। আজীবন সে আপনার খেদমত করে যাবে।

এরপর তিনি আর দাঁড়ান না, চলে যান খুশিমনে আপন গৃহে। ইতিহাস বলে, সেদিন থেকেই হজরত আনাস (রা.) আল্লাহর নবীর কাছে থেকে যান এবং তাঁর সকাল-সন্ধ্যার খাদেম বনে যান।

ধন্য তুমি হে উম্মে সোলাইম!

গতকাল তুমি আবু তলহার ইসলাম গ্রহণকে প্রাধান্য দিয়ে নারীর বিশেষ অধিকার মোহরের দাবি ছেড়ে দিলে। আর আজ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসায় ছেড়ে দিলে নিজের ছেলের অধিকার।

উম্মে সোলাইমের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ

উম্মে সোলাইমের ভেতর-বাইরের অবস্থা ছিল তিনি কোনো লৌকিকতা পছন্দ করতেন না। তিনি ছিলেন এক বিস্ময়, ঘরে ও বাইরে। আল্লাহর ইবাদত আর স্বামীর খেদমত, এ দুই ছিল তাঁর জীবনের সেরা ব্রত। অনেক মহিলা আল্লাহর ইবাদত করলেও স্বামীর খেদমত ও আনুগত্যকে প্রয়োজন মনে করে না। উম্মে সোলাইমের কাহিনি থেকে তাঁরা কি নিবে কোনো শিক্ষা?

কিছুদিন পর আবু তলহার ঘরে তাঁর এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। চাঁদের মতো সুন্দর চেহারা। নাম রাখা হয়, আবু উমায়ের। আবু তলহা খুব ভালোবাসতেন তাঁকে। আল্লাহর নবীও ভালোবাসতেন তাঁকে। আল্লাহর নবী তাঁর পাশ দিয়ে যেতেন, আর দেখতেন সে ছোট্ট একটি পাখি নিয়ে খেলা করছে। পাখির নাম, নুগায়ের। পাখি একদিন মরে যায়। নবীজি দেখলেন, আবু উমায়েরের মন খুব খারাপ। তিনি তখন একটু মজা করে

বললেন,

হে উমায়ের! নুগায়ের কোথায় তোমার?

আবু উমায়ের একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রিয় ছেলের অসুস্থতায় আবু তলহা ভেঙে পড়েন। অসুস্থতা দিন দিন বাড়তে থাকে। একদিন আবু তলহা কোনো এক প্রয়োজনে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গমন করেন। ফিরেন বেশ দেরি করে। এর মধ্যে ছেলের অসুস্থতা আরও বেড়ে যায়। সে মৃত্যুবরণ করে। তখন উম্মে সোলাইম সন্তানের পাশে বসা ছিলেন। আত্মীয়স্বজনের ভেতর শোকের ছায়া নেমে আসে। অনেকেই শোকগ্রস্ত হয়ে নিজেদের ধরে রাখতে পারেন না। উম্মে সোলাইম সবাইকে সান্ত্বনা দেন। এবং বলেন,

সাবধান! কেউ তোমরা আবু তলহাকে মৃত্যু সংবাদ দিবে না, যা বলার আমিই বলব তাঁকে।

এরপর তিনি ছেলেকে গৃহের এক কোণে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখেন। তারপর স্বামীর জন্য খাবারের আয়োজন শুরু করেন। আবু তলহা ফিরে এসে তাঁর কাছে জানতে চায়,

ছেলে কেমন আছে?

উম্মে সোলাইম বলেন,

আগের চেয়ে ভালো।

আবু তলহা দেখতে উদ্যত হতেই বাধা দিয়ে তিনি বলেন, না। এখন না। ও এখন শান্ত, ঘুমোচ্ছে, ওঁকে জাগানোর প্রয়োজন নেই এখন।

এরপর তিনি আবু তলহার সামনে রাতের খাবার উপস্থিত করেন। স্বামী তৃপ্তিভরে খান। তারপর তিনি স্বামীর জন্য সাজগোজ করেন। স্বামী আকৃষ্ট হয়ে স্ত্রীমিলন করেন।

উম্মে সোলাইম যখন দেখেন, স্বামী এখন পূর্ণতৃপ্ত ও সুখপুষ্ট, তখন তিনি বলেন,

আবু তলহা! বলো তো, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো পরিবারকে কোনো কিছু ধার দেয়, অতঃপর সে যদি তাঁর জিনিস ফেরত চায়, তাহলে সে পরিবার কি উক্ত জিনিস তাঁকে ফেরত না দেওয়ার কোনো অধিকার রাখে?

আবু তলহা বলেন,

না। ফেরত না দেওয়ার কোনো অধিকার রাখে না সেই পরিবার।

উম্মে সোলাইম এবার বলেন,

আমাদের প্রতিবেশীদের ব্যাপারে কি তুমি আশ্চর্যবোধ করবে না?

কেন? তাঁদের কী হয়েছে?

এক ব্যক্তি তাঁদের ধার দিয়েছে। সেই ধারের জিনিস অনেক দিন পর্যন্ত তাঁদের কাছে থাকার কারণে তাঁরা ধরেই নিয়েছে যে, তাঁরাই সেই জিনিসের মালিক হয়ে গেছে। এরপর যখন প্রকৃত মালিক ধারের জিনিস চায়, তখন তাঁরা তা ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানায়!

আবু তলহা বলে,

বড় খারাপ কাজ করেছে তাঁরা!

তখন উম্মে সোলাইম বলেন,

এই যে তোমার ছেলে, ও ছিল আল্লাহর দেওয়া ধারের জিনিস। তিনি এখন তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিয়েগেছেন। তোমার ছেলের ব্যাপারে ধৈর্য ধরো। এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।

এ পর্যন্ত শোনার পর আবু তলহা অস্থির হয়ে যান। পিতৃত্বের বেদনায় আহ! করে চিৎকার করে ওঠেন। এরপর অধৈর্য হয়ে বলেন,

কসম আল্লার! এ রাতে তুমি আমাকে

ধৈর্যে পরাস্ত করতে পারবে না।

এরপর কষ্টকে সংবরণ করে তিনি ছেলের কাফন-দাফন সম্পন্ন করেন। সকালে উঠে দরবারে নববীতে ছুটে যান। সব কথা বলেন, আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে। তখন আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের [স্বামী-স্ত্রীর] জন্য বরকতের দোয়া করেন।

এ হাদিস বর্ণনাকারী বলেন,

এরপর আমি তাঁদের ঔরসে জন্ম লাভ করা সাত সন্তানকে দেখেছি মসজিদে নববীতে। সবাই ছিলেন হাফেজে কুরআন।

কী শুনলে হে নারী! উম্মে সোলাইমের ঘটনা থেকে কী অর্জন করলে তুমি? সকল প্রতিকূলতা ডিঙ্গিয়ে তিনি কীভাবে দীনকে আঁকড়ে ধরেছেন! দেখেছ কি, কখনো এমন স্ত্রী! যাঁর চোখের সামনে কলিজার টুকরো সন্তানের মৃত্যু হয়, তারপরও তিনি অবিচল থেকে ধৈর্য ধরে কী চমৎকার করেই না স্বামীর খেদমতে নিজেকে অর্পণ করেন! শারীরিক এবং মানসিক খেদমতে! কোথাও পাবে কি এর কোনো নমুনা? তুমি নিজেই হয়ে যাও না তাঁর নমুনা? নতুন উম্মে সোলাইম? পৃথিবীতে উম্মে সোলাইমদের ভীষণ প্রয়োজন। হতাশার কথা, তাঁদের সংখ্যা বাড়ছে না; বরং দিন দিন শুধু কমছে। বড়ই হতাশার কথা এটি।

উম্মে সোলাইমের কোমলতা কতই না কোমল।

উম্মে সোলাইমের আদর্শ কতই না সুন্দর।

পৃথিবীর কোনো ইতিহাসে তুমি খুঁজে পাবে কি এমন কোমল ও আদর্শবান স্বামী-ভক্ত ও প্রভু-ভক্ত নারীর সন্ধান?

আরও কিছুক্ষণ উম্মে সোলাইমের সঙ্গে

যে মহিলার ইমান ও দীন এবং সততা ও দৃঢ়তা হবে এমন, তাঁর বরকত ও কল্যাণময়তা পরিবারকে আলোকিত করবেই। সুকুমার হবে তাঁর ছেলেরা। সঠিক পথে চলবে তাঁর মেয়েরা। তাঁর স্বামীও হবে প্রভাবিত তাঁর কারণে। তাই উম্মে সোলাইমের সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পর আবু তলহার সম্মান ও মর্যাদা যদি বেড়ে যায়, তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

বরাবরই উম্মে সোলাইম স্বামীকে উদ্বুদ্ধ করতেন দাওয়াত ও জিহাদে যেতে। আল্লাহর ইবাদতে বেশি বেশি নিবিড় হতে। ্রীর এ উৎসাহদান বৃথা যায়নি। তিনি স্ত্রীর কথায় কী যেন খুঁজে পেতেন। তাই ভীষণ প্রভাবিত হতেন। তার কিছু নমুনা নিচে দেখো,

ওহুদ যুদ্ধ। তীরন্দাজদের ভুলের মাশুল গুণতে হচ্ছে মুসলমানদের। মুসলিম শিবিরে নেমে এসেছে চরম বিশৃঙ্খলা। মারাত্মক বিপর্যয়। সাহাবায়েকেরাম দিশেহারা। কেউ লুটিয়ে পড়ছেন শাহাদতের রক্তিম বিছানায়। কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করছেন। মুশরিকরা সুযোগ পেয়ে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার উদ্দেশে তাঁর নিকট চলে আসে। বিশিষ্ট সাহাবিগণ তখন তাঁর চতুরপার্শ্বে মানবঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে যান। তাঁরা নিজেরাও ভীষণ ক্লান্ত। আহত। রক্ত ঝরছে ক্ষতস্থান থেকে। খসে পড়ছে দেহের গোশত।

এ অবস্থায়ও নিজেদের কথা ভুলে যান। ঘিরে রাখেন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। বর্শার তীব্র আঘাত, কিন্তু তা
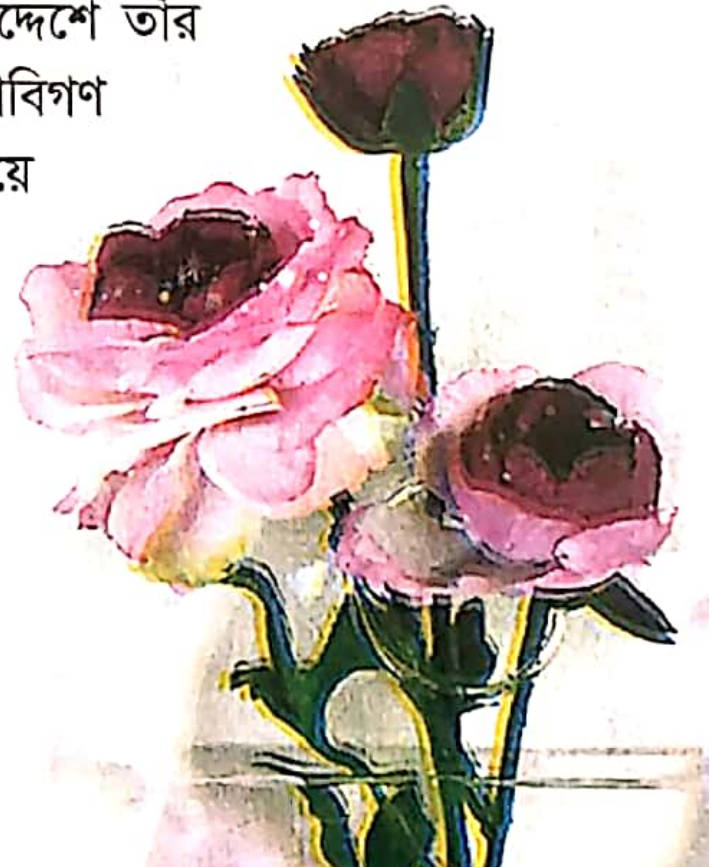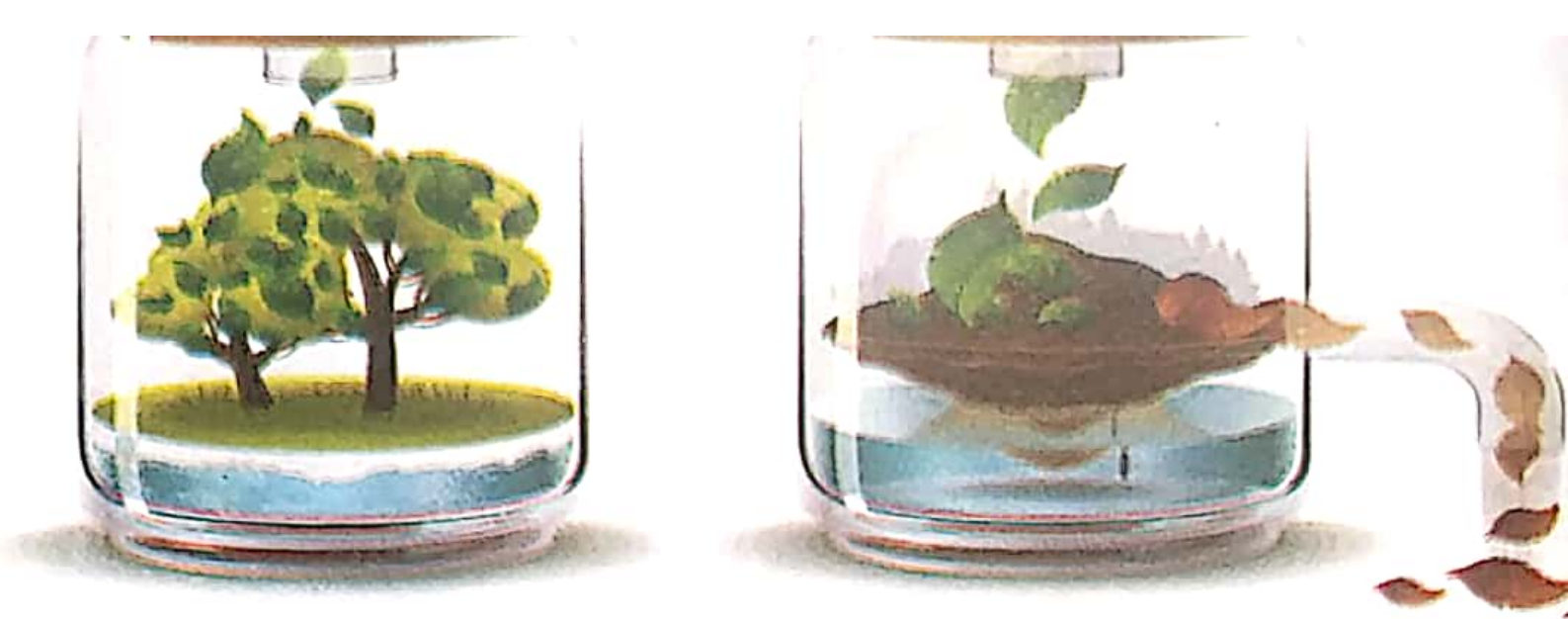
লাগছে তাঁদের দেহে। আসছে ক্ষিপ্রগতিতে তলোয়ারের আঘাত, আর সাহাবায়ে কেরাম ঠেকাচ্ছেন পাল্টা আঘাতে, প্রয়োজনে বুক পেতে দিয়ে।

এঁদের মাঝে ছিলেন আবু তলহা।

তিনি উচ্চ কণ্ঠে বলেন–

يَارَسُوْلَ اللهِ لَايُصِيْبُكَ سَهْمٌ...نَحْرِيْ دُوْنَ نَحْرِكَ...

হে আল্লাহর রসুল! একটি তীরও আপনার গায়ে এসে লাগবে না। আমার গলা আপনার গলার বরাবর [আমি আপনাকে আড়াল করে কাফেরদের সঙ্গে লড়াই করে যাবো!]

কাফেররা চারপাশ থেকে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে আক্রমণ শুরু করে। কারও হাতে তীর, কারও হাতে ধনুক। কারও হাতে তলোয়ার, কারও হাতে খঞ্জর।

আবু তলহা আঘাতে আঘাতে কাবু হয়ে যান। মন দুর্বল না হলেও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে একপর্যায় শরীরকে আর ধরে রাখতে পারেন না। লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। তখন আবু উবায়দাহ দ্রুতবেগে ছুটে আসেন তাঁর কাছে। দেখলেন, আবু তলহা ধরাশায়ী। তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন,

دُوْنَكُمْ أَخَاكُمْ فَقَدْ أَوْجَبْ.

তোমাদের ভাইকে সহযোগিতা করা তোমাদের জন্য ওয়াজিব।

তখন কয়েকজন সাহাবি ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে যান। দেখেন, তাঁর দেহে রয়েছে ষোল-সতেরটি আঘাত।

হ্যাঁ, উম্মে সোলাইমের সঙ্গে বিবাহের পর আবু তলহার একমাত্র ব্রত ছিল দীনের পতাকা বুলন্দ করা। আল্লাহর রসুল তাঁর শানে বলেন,

لَصَوْتُ أَبِيْ طَلْحَةَ فِيْ الْجَيْشِ أَشَدُّ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ فِئَةٍ.

যুদ্ধক্ষেত্রে মুশরিকদের বিরুদ্ধে আবু তলহার একার কণ্ঠ একদল মানুষের কণ্ঠের চেয়েও অধিক শক্তিশালী ছিল।

[মুসনাদ ফাতহে রাব্বানি খণ্ড. ২২/ পৃ. ৫৮৯]

এ যদি হয় তাঁর কণ্ঠের অবস্থা, তাহলে বলো, কী হবে তাঁর যুদ্ধকালীন বীরত্বগাথার অবস্থা?

ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে, তিনি ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। তুমিও তাঁর মতো হয়ে যাও না!

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু পুরুষদের দাওয়াত দেননি, দিয়েছেন নারীদেরও। শুধু পুরুষদেরই বাইয়াত করেননি, করেছেন মহিলাদেরও । কথাও বলেছেন পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের সঙ্গেও। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ সবাই শাস্তি ও পুরস্কার প্রাপ্তিতে সমান। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۹۷﴾

মুমিন পুরুষ ও নারীর যে কেউ সৎকর্ম করবে, অবশ্যই তাঁকে আমি নিশ্চিত আনন্দময় জীবন দান করব এবং তাঁদেরকে তাঁদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।

[সুরা নাহল : ৯৭]

মানবাধিকারেও তাঁরা উভয়ে সমান। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের–ই একে অন্যের প্রতি কিছু দায়-দায়িত্ব রয়েছে। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَلا إِنَّ لَكُمْ عَلى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا.

সাবধান! মনে রাখবে, তোমাদের ওপর রয়েছে তোমাদের স্ত্রীদের হক এবং তোমাদের স্ত্রীদের ওপরও রয়েছে তোমাদের হক।

নারী-পুরুষের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ.

তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত সে-ই, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকি।

নারী যখন নিজের সম্মান নিজে বজায় রাখবে, সবাই তখন তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করবে। নারী সম্মানিত ও মূল্যবান ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত সে বিশ্বস্ত ও আমানতদার। যখন সে বিশ্বাস নষ্ট করে, তখন সে তুচ্ছ ও মূল্যহীন হয়ে যায়।

এবার একটুভাবুন! আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থার ওপর। মক্কা বিজয়ের সময় কাফেররা দিশেহারা হয়ে পড়ে। কেউ আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে তলোয়ার বের করে, কেউ ইসলাম কবুল করে, আবার কেউ আত্মগোপনে চলে যায়। যারা তরবারি বের করে, তাদের দুজনের লড়াই হয়েছে হজরত আলি (রা.)-র সঙ্গে। পরে তারা রণেভঙ্গ

দিয়ে পালিয়ে যায়। এবং আলি (রা.)-র-ভগ্নী উম্মে হানির গৃহে আশ্রয় নেয়। হজরত উম্মে হানি তাদের নিরাপত্তা দেন। একটু পরই হজরত আলি (রা.) সেখানে তলোয়ার নিয়ে উপস্থিত হন। বলেন, আমি লোক দুটোকে হত্যা করব।

উম্মে হানি তা হতে দেন না। বরং তারা যে কামরায় ছিল তার দরজা বন্ধ করে দেন। তারপর দ্রুত ছুটে যান আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। নবীজি হন্তদন্ত অবস্থায় দ্রুত গতিতে আসতে দেখে তাঁকে বললেন,

উম্মে হানি! তোমাকে স্বাগত! কী মনে করে এলে আমার নিকট?

উম্মে হানি বলেন,

আলি, এমন দুজন লোককে হত্যা করতে চায়, যাদের আমি নিরাপত্তা দিয়েছি।

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

যাও, তুমি যাদের মুক্তি দিয়েছ, আমিও তাদের মুক্তি দিলাম। তুমি যাদের নিরাপত্তা দিয়েছ, আমিও তাদের নিরাপত্তা দিলাম! সুতরাং সে যেন তাদের হত্যা না করে।

মহান আল্লাহ তাআলা নারীদের অধিকার ও সম্মান দিয়েছেন তাঁদের প্রশান্তময় জীবনের স্বার্থে। যেমন নারীর অনুমতি ব্যতীত তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা যাবে না। তাঁর অনুমোদন ছাড়া তাঁর সম্পদে হস্তক্ষেপও করা যাবে না। যদি কোনো দুষ্ট লোক তাঁর চরিত্রে কালিমা লেপন করে ও অপবাদ দেয়, তাহলে ওই কালিমা লেপনকারী ও অপবাদদানকারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। তাঁর পিতাকে

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁর সঙ্গে ভালো আচরণ করার জন্য। তাঁর সন্তানকে আদেশ করা হয়েছে, তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে ও সদা তাঁর অনুগত থাকতে। তাঁর ভাইকে বলা হয়েছে, সাবধান! বোনের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করবে না!

বরং অনেক ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে পুরুষেরও ওপর। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِيْ وَ لِوَالِدَيْكَ ۚ

আমি তো মানুষকে তাঁর পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মা সন্তানকে কষ্টেরপর কষ্টবরণ করে গর্ভে ধারণ করে। এবং তাঁর দুধ ছাড়ানো হয় দুবছর পর। সুতরাং আমার প্রতি এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

বোখারি ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে,

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে,

হে আল্লাহর রসুল! আমার জন্য সবচেয়ে অধিক সদ্ব্যবহারের হদকার কে? তখন তিনি বলেন, তোমার মা। অতঃপর কে? তোমার মা। তারপর কে? তোমার মা। এরপর তোমার বাবা।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) দেখলেন, এক লোক কাবা তওয়াফ করছে। তখন তাঁর পিঠে এক বৃদ্ধা। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করেন,

ইনি কে?

লোকটি বলে,

ইনি আমার মা! বিশ বছর ধরে আমি তাঁকে পিঠে বহন করছি। ইবনে ওমর! আপনার কি মনে হয়, আমি আমার মার হক আদায় করতে পেরেছি?

তখন ইবনে ওমর (রা.) বলেন,

না না, তুমি তাঁর একটি দীর্ঘশ্বাসেরও
হক আদায় করতে পারোনি!

নরওয়ে থেকে আফ্রিকা

মুসলিম উম্মাহর দুর্ভাগ্য, তাঁদের মেয়েরা দীনের সহযোগিতা করছে না। বরং দীন থেকে দিন দিন তাঁরা দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে অন্যায়-অনাচার প্রকাশ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। অপরাধের বিভিন্ন ভয়াবহচিত্র সমাজকে কলুষিত করছে। ইসলামি আইন লঙ্ঘনের যেন মহড়া চলছে। নারীর জন্য ইসলাম 'পর্দার' যে বিধান দিয়েছে, তা নারীরাই লঙ্ঘন করছে, অবহেলায়; অবলীলায়। নারীরা হারিয়ে যাচ্ছে প্রণয় ও ভালোবাসার নামে অবৈধ সম্পর্কের তিমির আঁধারে।

মাঝে মধ্যে আমার মনে হয়, আল্লাহর আজাব আমাদের সহসাই গ্রাস করবে। সবচেয়ে বেদনাদায়ক অন্যায়-অনাচার ও সীমালঙ্ঘনের প্রতিযোগিতায় যারা লিপ্ত, তাঁরা আমাদেরই আত্মীয়স্বজন কিংবা নিকট পরিচিত। তথাপি আমরা তাঁদের হাত ধরে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি না। প্রতিবাদমুখর হই না। অথচ আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন,

তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, সে যেন তার প্রতিবাদ করে..।

বলো তো! তুমি কি তোমার সাধ্যানুযায়ী অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করেছ? হায়! যদি না কর, তাহলে কী অবস্থা হবে তোমার কেয়ামতের দিন? যদি তোমার বান্ধবী কিংবা সহপাঠী বা সতীর্থ তোমার বিরুদ্ধে চিৎকার করে বলে ওঠে, কেন তুমি আমাদের অন্যায় কাজ করতে দেখেও বাধা দিলে না? কেন আমাদের উপদেশ দিলে না? কেন বুঝাওনি আমাদের? তাহলে তখন কী জবাব দেবে তুমি?

অথচ অপরদিকে বিধর্মীরা তাদের বাতিল ধর্মের জন্য কী ত্যাগ ও কুরবানিই না করে থাকে। এক নমুনা দেখো এখানে–

এক দাঈ [আল্লাহর পথে আহ্বানকারী] বলেছেন,

আমি আফ্রিকার এক শরণার্থী শিবিরে এক দাওয়াতি সফরে গিয়েছিলাম। বড় ক্লান্তিকর সফর। রাস্তা ছিল দুর্গম ও ভীতিকর। চলার যেন কোনো শেষ নেই। যেতে যেতে চোখে পড়ছিল শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। যে গ্রামেই পৌঁছতাম, গ্রামবাসী আমাদের সতর্ক করে দিতেন, ডাকাত ও দস্যুদের ব্যাপারে।

এক সময় আমরা নিরাপদেই আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে যাই। সময়টা ছিল রাতের বেলা। আমার আগমনে ওরা খুব খুশি হয়। এবং আমার জন্য আলাদা তাঁবুর ব্যবস্থা করে। দূরসফরের ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসে। তাই দেরি না করে তাঁবুর জীর্ণ বিছানাতেই গা এলিয়ে দিই। তখন আমার মনে আসতে থাকে এলোমেলো অনেক চিন্তা।

আমি কিছুটা গর্ব অনুভব করি। যা কিছুটা অহঙ্কারের পর্যায় চলে যায়। ভাবছিলাম, কোন সে টানে আমি এ দুর্গম পথের সফরের সাহস করলাম? আমি ছাড়া অন্য কেউ হয়তো এমন সফরের সাহস করত না। কে করবে এত কষ্ট, এত যাতনা? আমি ছাড়া! অর্থাৎ আমি শুধু তখন আমাকে নিয়েই ভাবছি। কেবল আমি আমি করছি। মনে হয়, শয়তান আমার ভেতরে কাজ করছে। আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইস্তিগফার পড়ে শুয়ে পড়লাম।

সকালে আমি বেরিয়ে পড়ি আশপাশের ঘরবাড়ি দেখার জন্য। ঘুরতে ঘুরতে শরণার্থী শিবির থেকে বেশ খানিক দূরে একটা কূপের কাছে চলে আসি। দেখি একদল নারী মাথায় পানির কলশি নিয়ে বাড়ি ফিরছে।

এদের মাঝে এক মহিলা শ্বেতবর্ণের। আফ্রিকান কালো মহিলাদের মাঝে এমন শ্বেতশুভ্র এক মহিলাকে দেখে আমি ভাবি, শরণার্থী শিবিরের-ই কোনো এক মহিলা হবে এ। হয়তো শ্বেত রোগের কারণে ওকে এমন সাদা দেখাচ্ছে। কিন্তু আমার সঙ্গিকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি জানান, এ মহিলা নরওয়ের অধিবাসী। বয়স ত্রিশ। খৃষ্টান। ছয় মাস ধরে এখানে অবস্থান করছে। আফ্রিকানসম্প্রদায়ের সঙ্গে ও একেবারে মিশে গেছে। এখন পরিধানও করছে এদেশের পোশাক। আহারও করছে এদেশের খাবার। আমাদের কাজেও ও সহযোগিতা করে। রাতের বেলা সব মহিলাদের জড়ো করে তাদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে। তাদের লেখাপড়া শেখায়। মাঝে-মধ্যে নাচও শেখায়। কত এতিমের মাথায় ও হাত বুলিয়ে দিয়েছে এবং কত বেদনা-পীড়িত মানুষের বেদনা দূর করে দিয়েছে। তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

নরওয়ের তরুণীর কথা একটু ভাবো! কিসের টানে ছুটে আসে ও এই দূর অরণ্যে? অথচ দীন ও আকিদায় ও ভ্রান্ত? কেন ও ছেড়ে এল ইউরোপের সভ্যতা এবং সেখানকার সবুজ-শ্যামল বাগ-বাগিচা? কোন সেই পরশে ছয় মাস ধরে পড়ে আছে এই অক্ষম-অসহায় লোকদের সঙ্গে? অথচ যৌবন-বসন্তের একেবারে শীর্ষে অবস্থান করছে ও? এ বয়সে যৌবনের স্বাদ, রস, গন্ধ কাকে না হাতছানি দেয়?

বলো তো, ওর কথা ভাবতে ভাবতে তোমার কাছে কি নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে না? বোঝো না! ও খৃষ্টান ধর্মের এক ভ্রষ্টা নারী হয়েও আফ্রিকার প্রতিকূলতাকে কষ্টে-সৃষ্টে জয় করে ওখানে কেন পড়ে আছে? শুধু কি প্রতিকূলতা? মহা প্রতিকূলতা! আফ্রিকার ঝোপ-জঙ্গলের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে বসবাস করা কজনের পক্ষে সম্ভব? তারপরও বৃটেন-আমেরিকা-ফ্রান্স থেকে কেন ছুটে আসছে এই আফ্রিকায় তরুণ-তরুণীরা ? কেন ওরা বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে এখানে এসে আশ্রয় নিচ্ছে ছোট্ট ছোট্ট কুঁড়েঘরে বা মাটির ঘরে? আর খাচ্ছে অখাদ্য? পান করছে নদী-নালার বিষাক্ত পানি? কেন? কেন?... নিজেকে প্রশ্ন করো! উত্তর পেয়ে যাবে। শিশুদের লালন-পালন করার জন্য? অবলা নারীদের চিকিৎসার জন্য? অন্য কথায়, দীনি ব্রত পালনের জন্য? যে দীন বিকৃত! যে দীন মনগড়া। এমন দীনের খেদমতের জন্য ওরা বেছে নেয় বিলাসী জীবনের বদলে অরণ্য-আফ্রিকার কষ্ট-যাতনাঘেরা ফকিরি জীবন! ওরা যখন ওদের এ ধর্মীয় ব্রত পালন শেষে স্বদেশে ফিরে যায়, তখন দেখলে চিনাই যায় না! কী ছিল আর কী হয়ে ফিরেছে! বদন-দীপ্তি নিষ্প্রভ! ত্বকের মসৃণতা উধাও!

বলবে কি হে আমার মুসলিম বোন! তাদের তুলনায় তুমি কী অবদান রেখেছ তোমার সত্যধর্ম ইসলামের জন্য?

اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ۚ

যদি তোমরা কষ্ট পাও, তবে তারাও তো কষ্ট পায়, অথচ আল্লাহর নিকট তোমরা যা আশা করো, তারা তা আশা করে না।

[সুরা নিসা : ১০৪]

আরেক দাঈর কথা শোনো−

আমি তখন জার্মানিতে। কে যেন দরজায় নক করে। কাছে এসে দেখি, এক তরুণী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করি, কী চাও?

সে বলে, দরজা খুলুন।

আমি বলি, না, দরজা খোলা যাবে না। আমি মুসলমান। আমার স্ত্রী ঘরে নেই। এ অবস্থায় তোমার জন্য আমার অন্দরমহলে প্রবেশ করা জায়েজ নেই।

কিন্তু তরুণী এতে ক্ষান্ত হয় না। চলেও যায় না। দরজা খুলতে অস্বীকৃতি জানিয়ে যাচ্ছি আমি। একপর্যায় সে বলে,

আমি ধর্মীয় এক প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছি। আপনাকে কিছু বই-পুস্তক ও আমাদের পরিচিতিমূলক কিছু কাগজপত্র দিয়েই আমি চলে যাব। দয়া করে একটু দরজা খুলুন।

আমি বলি,

না, আমার এ সবের প্রয়োজন নেই। এই বলে, আমি সেখান থেকে আমার কামরায় চলে যাই। তখন সে দরজার ফাঁক দিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে তার ধর্ম সম্পর্কে দশ মিনিটের মতো ব্যাখ্যা শুনিয়ে যায়। ওর বক্তব্য শেষ হলে আমি দরজার কাছে এসে জিজ্ঞেস করি,

কেন এ পরিশ্রম? নিজেকে এভাবে কেন কষ্ট দিচ্ছ? আমি তোমার কথা শুনতে চাই না, তারপরও কেন শুনাচ্ছ?

ও বলে,

আপনি শুনুন আর না-ই শুনুন। আমি তো বলতে পেরেছি। আমি এখন স্বস্তি অনুভব করছি। কারণ, আমি

যতটুকু সম্ভব আমার দীনের হক আদায় করেছি।

إِنْ تَكُوْنُوْا تَأْلَمُوْنَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُوْنَ كَمَا تَأْلَمُوْنَ ، وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ،

যদি তোমরা কষ্ট পাও, তবে তারাও তো কষ্ট পায়, অথচ আল্লাহর নিকট তোমরা যা আশা করো, তারা তা আশা করে না। [সুরা নিসা : ১০৪]

জিজ্ঞেস করো নিজেকে

বলো তো, ইসলামের জন্য তুমি কী করেছ, কী সয়েছ? কজন নারী তোমার হাতে তওবা করেছে? দিশেহারা তরুণীদের হেদায়েতের জন্য তুমি কতটুকু শ্রম ও সম্পদ ব্যয় করেছ?

অনেক পূণ্যবতী নারীদের বলতে শুনি,

দাওয়াত দেওয়ার দুঃসাহস আমি করতে পারব না। অন্যায় কাজের বিরোধিতা করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়!

আশ্চর্য! তাহলে এক পাপাচারিনীকণ্ঠশিল্পী হওয়ার দুঃসাহস কীভাবে হয় তোমার? হাজার হাজার মানুষের সামনে গলা ছেড়ে আর রূপেরবাহার দেখিয়ে যখন গান গাও এবং নাচ করো, তখন তোমার লজ্জা লাগে না? জানো কি! তারা তোমার গান খাওয়ার আগে তোমার রূপ খায় গিলে গিলে! গান গাইতে গিয়ে কেন বলো না, আমার লজ্জা হয়, আমার ভয় হয়?

নির্লজ্জ নৃত্যশিল্পী হতে লজ্জা হয় না, হাজার হাজার মানুষের সামনে শরীর প্রদর্শন করতেও অস্বস্তি লাগে না তোমার! যত অস্বস্তি শুধু

আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকতে ও আনতে!

শোনো হে মেয়ে!

আমরা তোমার শত্রু নই, বরং কল্যাণকামী। তাহলে তুমি কেন তোমার বোনের কল্যাণ কামনা করবে না? কেন তাঁকে আল্লাহর পথে ডাকবে না? শয়তানের দলের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্বতা নষ্ট হয়ে যাবে বলে?

আরও অবাক করার বিষয়, তরুণীদের কেউ কেউ অশ্লীলতা বিনিময় করে! একে অপরকে অশ্লীল পত্রিকা দেয়! অশ্লীল গানের ক্যাসেট ও সিডি দেয়! একে অপরকে ডেকে নিয়ে যায়, খারাপ ও বিপজ্জনক আসরে!

এ সব কি অন্যায় নয়! এবং অশ্লীল কাজে সহযোগিতা নয়! শয়তানের দলভুক্ত হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা নয়! অন্যায় কাজে একে অপরকে টানার ও সহযোগিতা করার যে ভালোবাসা, তা একদিন শত্রুতা ও ঘৃণায় রূপান্তরিত হবে। আল্লাহ বলেন,

اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٧﴾

সাবধান! বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে। একমাত্র মুত্তাকিরা ব্যতীত।

এটি হবে তাদের হাশরের ময়দানের অবস্থা। অপমান ও অনুশোচনার পোশাক পরানো হবে তাদের। জাহান্নামের এ নাফরমানদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ
وَّ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. وَّمَاْوٰىكُمُ
النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

তারপর কেয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে। এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দেবে। তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। [সুরা আনকাবুত : ২৫]

হ্যাঁ, তারা একে অপরকে অভিসম্পাত দেবে। অথচ দুনিয়াতে একজন আরেকজনের সঙ্গে গভীরভাবে মিশেছে। গল্পে গল্পে বহু রাত কেটেছে তাদের। হাস্যরসে মাতাল সন্ধ্যা পার করেছে তারা। করেছে ভালোবাসার উষ্ণ বিনিময়। কিন্তু ভুল, সবই ভুল। ক্ষণিকের মরীচি-কাময় স্বপ্ন, চিরকালের দুঃস্বপ্ন। সেদিন একজন আরেকজনকে বলবে, তুমিই আমাকে অবৈধ প্রেমালাপ, আর অশ্লীলতার দিকে ডেকে এনেছিলে না! তোমার ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।

অপরজন উত্তরে বলবে,

বরং তোমার ওপর আল্লাহর লানত বর্ষণ হোক। তুমিই না আমাকে গানের ক্যাসেট দিয়েছিলে!

আবার সে বলবে,

আমার ওপর নয়, বরং তোমার ওপর আল্লাহর লানত। তুমিই আমার সামনে গুনাহ ও পাপাচারের রঙিন জগৎ খুলে দিয়েছিলে!

অপরজনও নীরব থাকবে না; সেও বলবে,

না না, তোমার ওপরই লানত! গোনাহের পথ তুমিই আমাকে দেখিয়েছিলে!

আশ্চর্য! কোথায় হারিয়ে গেছে দুনিয়ার রং-তামাসা ও হাসি-আনন্দের সেই দিনগুলো? কোথায় তলিয়ে গেছে ফিসফিসানি আর কানাকানির পরশ-ভোলানো সূর্য?

মার্কেটে ঘুরতে এসে সেই যে কলকলিয়ে হাসতে হাসতে একে অপরের ওপর লুটিয়ে পড়তে, কোথায় গেল আজ তা? কেন আজ তোমরা একে অপরকে গালমন্দ করছ, অভিসম্পাত দিচ্ছ?

কারণ একটাই; তোমরা কখনো একে অপরের কল্যাণ কামনায়, ভালো চাওয়ায় এক হতে পারোনি। এক হয়েছ তখন, যখন সূর্য ডুবে

গেছে। জাহান্নামের আগুন এখন সামনে।

এ আগুন কি কোনো দিন নিভবে? তার লাভা কি কখনো ক্ষীণ হবে? না, কখনো স্তিমিত হবে না সেই লাভা, কখনো মন্থর হবে না সেই স্ফুলিঙ্গ। আজ কোথায় মাতৃজাতি!

নারী জাতির বর্তমান অবস্থা কী, একটু দেখো! পূর্ববর্তী মহীয়সীগণের তুলনায় কি তারা অনেক গুণ পিছিয়ে নয়? তারা কি বিরোধিতা করছে না শরিয়তের? পোশাকে, কথায় ও দৃষ্টিতে?

উপদেশ দান করলে বিরক্তিভরা কণ্ঠে তারা বলে,

সব মহিলাই তো এভাবে চলে। আমি স্রোতের উল্টো কেন চলব?

কি হতাশার কথা! কি লজ্জার কথা!

এ কি তোমার ইমানি চেতনা?

এত সহজে একজন অপরাধী হয়ে যেতে তোমার ভয় হয় না?

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿٣٦﴾

আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল কোনো বিষয়ের নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন নর-নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকে না। কেউ আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলকে অমান্য করলে, সে তো স্পষ্টতর পথভ্রষ্ট হিসেবেই গণ্য হবে। [সুরা আহজাব : ৩৬]

যেসব নারীকে আল্লাহ অভিসম্পাত দেয়, তাদের জন্য বড় দুঃখ হয়। দীন নিয়ে এরা করে তামাশা। পুরুষের সঙ্গে সামাঞ্জস্য রেখে পরিধান করে পোশাক। মহিমান্বিত ও গোপনীয় নারীত্বের সৌন্দর্য করে প্রদর্শন। এদের ওপর আল্লাহর লানত অবধারিত!

সেই তো হলো নির্লজ্জ নারী! যে উল্কি আঁকে নিজের শরীরের অঙ্গে! এসব

তো বেশ্যারা করে। ভাসমান পতিতারা করে। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

যে উল্কি আঁকে এবং আঁকায়, উভয়ের ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।

আর যে নকল চুল ব্যবহার করে সেও আল্লাহর অভিসম্পাত থেকে বাঁচতে পারবে না।

ওহে অভিসম্পাতসম্পন্না নারী!

জানো! আল্লাহর অভিসম্পাত কী?

আল্লাহর অভিসম্পাত হলো,

তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত হওয়া।

জান্নাতের পথ থেকে দূরে চলে যাওয়া।

বলো, তুমি তোমার জন্য ভালোবাসবে কোনটি?

জান্নাতের পথে থাকতে, না জান্নাতের পথ থেকে বিতাড়িত হতে?

শুধু উল্কি-চিহ্নের কারণে কিংবা নকল চুল ব্যবহার করার কারণে বা গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ হয় এমন পোশাক পরিধান করাতে, তোমার শেষ পরিণাম কি হবে, ভেবে দেখেছ কি কখনো? সাবধান! ভাবো আরও ভাবো, এরপর দাও উত্তর!

হে বঞ্চিত নারী!

প্রবৃত্তি ও শয়তানের ডাকে যখন নারী সাড়া দেয়, তখন-ই তার ইচ্ছে করে নিজেকে সাজিয়ে পরপুরুষের সামনে তুলে ধরতে। আর ভুলে যায় তখন আল্লাহর অভিসম্পাতের কথা। ভয়াবহ পরিণতির কথা।

নারী নিজেকে যেভাবে সাজায়, তা

যেমন অরুচিকর, ঠিক তেমনি শরিয়তনিষিদ্ধ। ভ্রূকে সরু করা, উপড়ে ফেলা অথবা মুণ্ডিয়ে ফেলা। যে নারী এমন করে, সে যেন শয়তানের নির্দেশ-ই পালন করে। আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿١١٨﴾ وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

এবং শয়তান বলে, আমি অবশ্যই তোমার বান্দার নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসরণকারী বানিয়ে নিব। এবং আমি অবশ্যই তাদের পথভ্রষ্ট করব। তাদের হৃদয়ে মিথ্যাবাসনা সৃষ্টি করব এবং আমি অবশ্যই তাদের নির্দেশ দিব, যেন তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করে। এবং আমি তাদের অবশ্যই নির্দেশ দিব, যেন তারা আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি ঘটায়। আল্লাহর পরিবর্তে যদি কেউ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তাহলে স্পষ্টতর সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। –[সুরা নিসা : ৪ আয়াত : ১১৯]

সুতরাং ভ্রূ সরু করা, আল্লাহর লানতের অন্তর্ভুক্তির কারণ। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-র সূত্রে আবু দাউদ শরিফে বর্ণিত হয়েছে,

যারা উল্কি আঁকে এবং অন্যকে এঁকে দেয়, যারা ভ্রূ সরু করে এবং কপালের চুল ওপড়ে ফেলে, তারা আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তনকারী। তাদের ওপর আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন।

এমন কাজ কী করে তুমি করবে? যার পরিণতি হলো মহান আল্লাহ তাআলার অভিসম্পাত? অথচ তুমি আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের বাসনা নিয়ে সালাত আদায় করছ! এ কী, কথা আর কাজে অমিল নয়? একদিকে কামনা করছ মহান প্রভুর
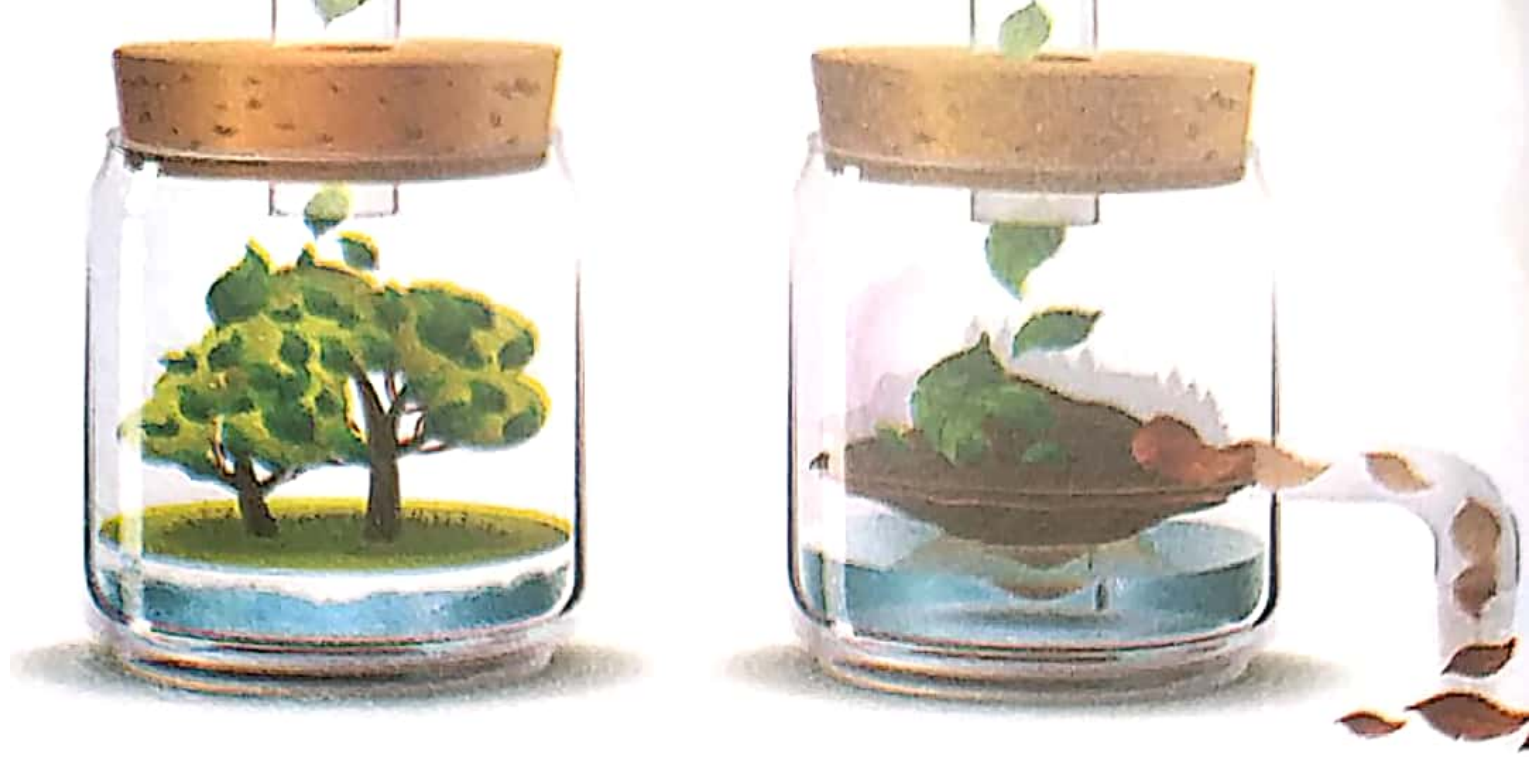
রহমত, অপরদিকে এমন কাজ করছ, যা তোমাকে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত, বড়ই অদ্ভুত।

ওলামায়ে হক ভ্রূ সরু করা বা ভ্রূ মুণ্ডানোকে হারাম বলেছেন। এটি হারাম হওয়ার বিশটি ফতোয়া রয়েছে আমার সংগ্রহে। সুতরাং আল্লাহর প্রতি ইমান আনার অর্থ হলো, তিনি যা করতে বলেছেন, তা করা আর যা করতে নিষেধ করেছেন, তা না করা। উল্কি আঁকা তো বিধর্মীদের কাজ। মনে রাখবে, কেউ যদি কোনো সম্প্রদায়ের অনুসরণ করে, তাহলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

সুতরাং যে যাকে ভালোবাসবে, তার হাশর হবে তার সঙ্গেই। তুমি এমন বলো না যে, তা তো অনেকেই করছে! তাহলে আমি বলব, অনেকেই তো মূর্তিপূজা করছে, তাই বলে তুমিও কি তাদের মতো মূর্তিপূজা করবে? অনেকেই তো ক্রুশ ঝুলিয়ে রাখে, তাই বলে তুমিও কি তাদের অনুসরণ করবে? তোমাকেই তোমার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। পৃথিবীতে কীভাবে তোমার জন্ম হয়েছে তার ধাপগুলো এক এক করে দেখো,

তুমি ছিলে তোমার পিতার পৃষ্ঠদেশে একা।

এরপর মায়ের গর্ভে এসেছ একা।

তারপর পৃথিবীতে এসেছ একা।

মৃত্যুবরণও করবে একা।

পুলসিরাত পার হবে একা।

একার সামনেই পেশ করা হবে তোমার আমলনামা।

তুমি জিজ্ঞাসিত হবে আল্লাহর সামনে একা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّآ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে এমন কেউ নেই যে, দয়াময়ের সরণাপন্ন হবে না বান্দারূপে। তিনি তাদের বেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদের গণনা করে রেখেছেন। এবং কেয়ামতদিবসে তাঁর নিকট তাদের আসতে হবে একা একা। [সুরা মারইয়াম : ৯৩-৯৫]

সমুদ্রতরঙ্গে

অনেক মুসলিম যুবতী ভেসে যাচ্ছে স্রোতের সঙ্গে। পর্দার ব্যাপারে সে উদাসীন। কাফের-মুশরিকরা যেসব পোশাক বাজারে ছাড়ছে, তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। যা নারীকে না ঢেকে, বরং তাঁদের; প্রবৃত্তচরিতার্থীদের সামনে আরও খুলে দেয়!

আশ্চর্য! কী করে তুমি ওদের খেলার পুতুল হও? যা ইচ্ছে তাই তোমাকে তারা পরাচ্ছে? কখনো তোমার পরনে নকশা করা বুটিদার জামা! কখনো পরনে তোমার শুধু কোমর পর্যন্ত স্কার্ট! কখনো থাকে তোমার দুকাঁধ অনাবৃত! কখনো তোমার শরীরে দেখা যায় খোলামেলা গাউন! এসব বৈচিত্র্যে প্রাধান্য পাচ্ছে কী? প্রতিফলিত হচ্ছে কী?

প্রাধান্য পাচ্ছে নারীকে আরও কীভাবে বেশি আবেদনময়ী করে মানুষের সামনে পেশ করা যায়! নারীর সত্যিকারের রক্ষাকবচ ও ভূষণ পর্দাকে কীভাবে নির্বাসনে পাঠানো যায়!

এভাবেই তোমাদের অজান্তে তোমাদের বানানো হচ্ছে ভোগ্যপণ্য। আর এতে পূরণ করছে শত্রুপক্ষ তাদের নিজেদের মনোবাসনা।

যে পোশাকে তোমার পর্দা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা কেন তুমি পরবে?

আজকাল আরও দেখা যায়, মেয়েদের জামা এত পাতলা কাপড়ে তৈরি যে, শরীরের স্পর্শকাতর জায়গাগুলোও সহজেই চোখে পড়ছে। ভেতরে শেমিজ জাতীয় কিছু না পরলে তো বলা হবে উলঙ্গই চলাফেরা করছে।

হিজাব ছেড়ে কেন এ অসভ্যদের ফ্যাশনের পেছনে ছুটছ হে নারী! জানো কি, হিজাব কাকে বলে? বোঝো কি, হিজাবের মাহাত্ম্য কী? হিজাব তো পুরুষের দৃষ্টি থেকে নারীর সৌন্দর্য ঢেকে রাখার একটি শরয়ী বিধান। পর্দা তো নিজেই সৌন্দর্যের প্রতীক। নারীর ভূষণকে বাদ দিয়ে তুমি সৌন্দর্য তালাশ করছ কোথায়? মুসলিম শরিফের হাদিসে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيْلَاتٌ رُؤُوْسُهُنَّ كَأَمْثَالِ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَايَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَايَجِدْنَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

দুই প্রকার জাহান্নামি, যাদের আমি দেখিনি। এক প্রকার একদল পুরুষ, যাদের নিকট রয়েছে গরুর লেজের
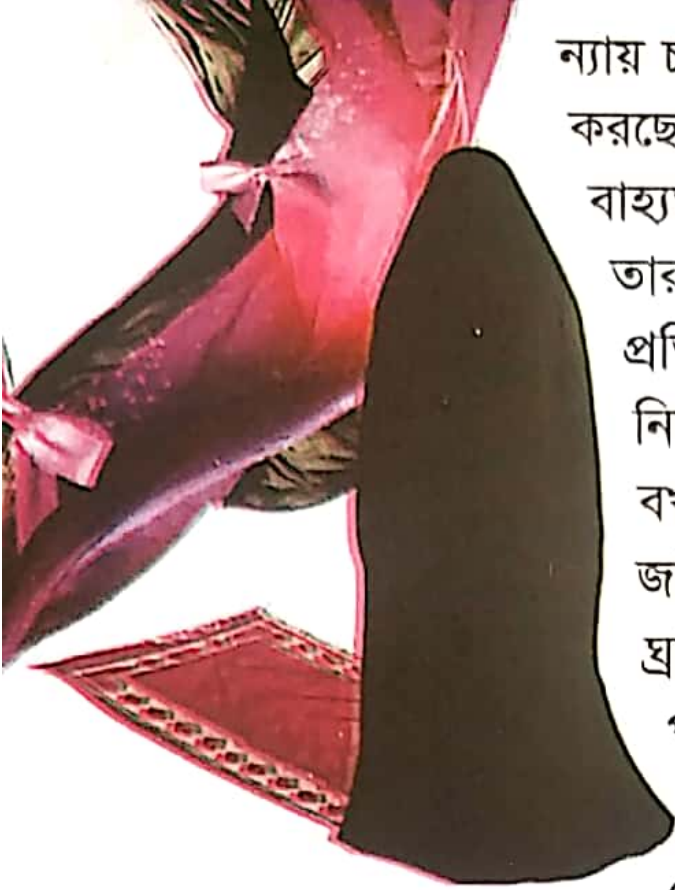
ন্যায় চাবুক, যা দ্বারা তারা মানুষদের প্রহার করছে। আরেক দল মহিলাদের, যারা বাহ্যত পোশাক পরিহিত হলেও বস্তুত তারা নগ্ন। যারা আকৃষ্ট হবে পুরুষদের প্রতি এবং পুরুষদেরও করবে আকৃষ্ট নিজেদের প্রতি। তাদের মাথা হবে বখতি উটের হাওদার মতো। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার ঘ্রাণও পাবে না। যদিও তার ঘ্রাণ পাওয়া যাবে অনেক অনেক দূর থেকে।

কে হতে চায় সেই নারী, যে পেতে চায় না জান্নাত কিংবা জান্নাতের সুগন্ধি?

তোমরা কেন বোঝো না, এই যে পর্দাহীনতা ও উলঙ্গপনা, এটি একটি মাধ্যম মাত্র। এ মাধ্যম তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, জানো? হারাম বা ব্যভিচার পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। আর তুমি কি চাইবে, একজন পুরুষ শুধু তোমার বেপর্দা ও রূপপ্রদর্শনের কারণে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যাক?

মনে রাখবে, তুমি যে বোরকা পরছ, তা ইসলামি হিজাব নয়, বরং পর্দার নামে এক ধরনের ফ্যাশন। আর এ ফ্যাশনে তুমি যখন বাইরে বের হবে এবং তোমার দেখাদেখি অন্য মেয়েরাও পরবে, তখন তাদের সবার গুনাহ তোমার আমলনামায় লেখা হবে। এবার একটু ভেবে বলো, তুমি কি হতে চাও গুনাহের কাজের আহ্বানকারী?

কার জন্য তুমি সাজবে?

এ ধরনের ফ্যাশনেবল হিজাব পরিহিতা কোনো মেয়ের কাছে যদি তুমি জানতে চাও,

কেন পরছ এ বোরকা?

সে বলবে,

অভিজাত বংশের কোনো প্রস্তাবকারীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য

কিংবা আমার স্বচ্চরিত্র স্বামীর জন্য।

আসলে কি তাই? তার কথা ঠিক আছে কি? না, মোটেই নয়। বরং এ অলঙ্কৃত হিজাবে সে বাইরে বের হলে এক ঝাঁক বখাটে তরুণ লুলোপ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে আর মজা লুটে। অথচ আমার বোনেরা অসভ্যদের চোখে নিজেদের রূপ প্রদর্শন করে হয় আপ্লুত! ভাবে, কেউ পছন্দ করে হয়তো আমার ব্যাপারে প্রস্তাব দিবে! আমি খুব স্মার্ট একজন নারী।

তোমাদের অবস্থা দেখে বড় আফসোস হয়। এরা কারা তোমরা জানো?

যাদের চোখে পড়তে তুমি ব্যাকুল, উন্মুখ?

আল্লার ভয়ে এদের হৃদয় কখনো কাঁপে না।

আল্লার বিধানের প্রতি এরা কখনো ভ্রূক্ষেপ করে না।

এরা বোঝে না নারীর সম্মান ও মর্যাদা।

সতীত্ব ও পবিত্রতা তো এদের চোখের কাঁটা।

এরা এতই নিকৃষ্ট যে, অবৈধ যৌনতার পাগলা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে নারীর সতীত্বের কোমল আঁচলের ওপর দিয়ে সুযোগ পেলেই দাবড়ে বেড়ায়। নারীর দিকে তাকায় যৌনতার দৃষ্টিতে। এরপর এরা যখন নারীর সতীত্ব লুটে নেয়, তখন তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে এবং খুঁজতে থাকে অন্য শিকারি।

তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছ, কেন আল্লাহ তোমাকে হিজাবের নির্দেশ দিয়েছেন? আল কুরআনের এ আয়াত নিয়ে একটু ভাবো,

وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ . وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ

তারা যেন গ্রীবা ও বক্ষদেশ কাপড় দ্বারা আবৃত করে এবং কারও কাছে নিজেদের অলংকার প্রকাশ না করে।

[সুরা আন নুর : ৩১]

একটু চিন্তা করো, কেন আল্লাহ্ তোমাকে তোমার মমতাময়ী চেহারা, চুল এবং শরীর ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন? কেন আল্লাহ তোমাকে পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন? তোমার এবং আল্লাহর মধ্যে কি কোনো শত্রুতা আছে? না, নেই। কারণ, আল্লাহ তো অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী। বান্দার প্রতি তিনি করেন না বিন্দুমাত্রও কোনো জুলুম। কিন্তু আল্লার শাশ্বত বিধান, সর্বযুগে কার্যকর তাঁর শরিয়ত, তাঁর অপরিবর্তনীয় বাণী, তাঁর ইনসাফপূর্ণ নীতি পুরুষকে যেমন দিয়েছে সুস্পষ্ট কিছু দিক-নির্দেশনা; তেমনি নারীকেও দিয়েছে কিছু সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। আল্লাহর হুকুম না মেনে পৃথিবীতে কারও টিকে থাকা সম্ভব নয়। এ জন্যই তো সতী নারীরা সম্মান ও মর্যাদা খোঁজে শুধু দীনের আনুগত্যে। আল্লাহর হুকুম পালনে।

এবার তোমার সামনে তুলে ধরছি সহিহ মুসলিমের একটি হাদিস। হাদিসটির মর্ম ও শিক্ষা নিয়ে একটু ভাবো তুমি–

আয়শা (রা.)-র কাছে একদিন এক মহিলা এসে জিজ্ঞেস করে,

ঋতুস্রাব মহিলা ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পর সালাত কাজা না করে শুধু সিয়াম কাজা করার কারণ কী? বিষয়টি আমাদের বুঝিয়ে বলুন।

আয়শা (রা.) তাঁর প্রশ্নে আশ্চর্য হয়ে বললেন,

তুমি কি দীন মানো না?

সে বলে, অবশ্যই মানি। কিন্তু জানতে চাই ব্যাখ্যা।

আয়শা (রা.) বলেন,

আল্লাহর নবীর উপস্থিতিতে আমাদের সামনে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হলে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয় শুধু সিয়াম কাজা করার, সালাত নয়।

হ্যাঁ, তোমাকেও দীনের অনুসরণ করতে হবে এভাবেই। আল্লাহর হুকুমের সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে। আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল যা বলেছেন, তাই তোমাকে মানতে হবে। কেন বলেছেন, এমন প্রশ্ন করা যাবে না। এ প্রশ্ন করা যেমন অবান্তর, তেমনি ধৃষ্টতাও।

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْٓا إِلَى اللهِ وَ رَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥١﴾

মুমিনদের ভাষ্য হলো, যখন তাদের পরস্পরের মাঝে কোনো বিষয়ে ফয়সালা করার সময় তাদের আহ্বান করা হয় আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দিকে, তখন তাঁরা বলে, আমরা শুনলাম ও মানলাম। আর তারাই তো হলো সফলকাম। [সুরা আন নুর : ৫১]

হ্যাঁ, সফলকাম তারাই যারা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে। আর যারা আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করে না, তারাই আধুনিকতার ধোঁয়া তুলে তোমাকে বিবস্ত্র করতে চায়। তোমার পর্দার সম্মান নষ্ট করতে চায়। শুধু তাই নয়, ওরা লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনে জীবনকে বাজি রাখে। ধনসম্পদ ব্যয় করে। বিনোদনের নামে অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, যৌনোদ্দীপক লেখালেখি এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উদ্দেশ্য শুধু পর্দার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্বহীন ও অপ্রয়োজনীয় করে তোলা। এরা চায়, মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতার বীজ বপণ করতে। তুমি যখন বাইরে যাও, তখন ওরা তোমাকে এবং তোমার রূপকে দেখে কাম-দৃষ্টির জ্বালা মেটাতে চায়। তোমাকে নাট্যমঞ্চে ও নৃত্যমঞ্চে প্রদর্শন করে ওরা সুখ পেতে চায়। তোমাকে শয্যাশায়িনী করে প্রবৃত্তির

মাতাল সুখে গা ভাসিয়ে দিতে চায়। ওরা শুধু জমিনেই তোমাকে ব্যবহার করতে চায় না, আকাশেও করতে চায় ব্যবহার।

বিমানবালা বানায় তোমাকে। ঠেলে দেয় হিজাবহীন ফ্যাশনেবল পোশাকের দিকে। উদ্দেশ্য থাকে শুধু নিজেদের চোখের জ্বালা মিটানোর। তোমার রূপসুধা পান করার। তোমার মুক্তাখচিত দাঁতের মুচকি হাসির দিকে তাকাবার।

বিস্মিত হতে হয়!

নারীর অধিকার বলতে কি ওরা পর্দাহীন বেলেল্লাপনাকেই শুধু বোঝে?

পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাড়ি চালনোকেই বোঝে?

মাহরাম ছাড়া যারতার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোকেই বোঝে?

শিক্ষাঙ্গনে, অফিস-আদালতে ও শিল্প-কারখানায় পরপুরুষের পাশে অবাধে বসাকেই বোঝে?

প্রচার মাধ্যমে অংশ নেওয়ার অবাধ প্রতিযোগিতাকেই বোঝে? শুধু কি এ গুলোই নারী-অধিকার? নারী স্বাধীনতা?

নিপাত যাক আল্লাহর শত্রুদের ইসলাম বিদ্বেষী এসব চিন্তাভাবনা কোথায় ওরা! একদিনও তো ওদের বিধবা ও অসহায়বৃদ্ধা কিংবা ওল্ডএজহোম-র মজলুম অধিবাসীদের অধিকারের প্রশ্নে সোচ্চার হতে দেখা যায় না? কোথায় ওরা! কোনো সন্তানকে তো ওরা কখনো বলেনি,

সাবধান! তোমার মা-বাবাকে ওল্ডএজহোম-এ পাঠিয়ে জ্যান্ত কবর দিও না! নাতি-নাতনীকে আদর-সোহাগ দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করো না তাদের!

এরা আসলে সমাজ সংস্কারের নামে সমাজের ভেতর ধরাতে চায় পচন। এরা মুনাফিক। আবদুল্লাহ বিন উবাই-র নাতি-পুতি ও মানস-পুত্র। এই অভিশপ্ত আবদুল্লাহ বিন উবাই ছিল আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের মুনাফিক সরদার।

এই মুনাফিকরাই আম্মাজান হজরত আয়শা (রা.)-র চরিত্রে কালিমা লেপনের অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। বড় নিকৃষ্ট লোক এই আবদুল্লাহ বিন উবাই। সে সুন্দর সুন্দর বাঁদী ক্রয় করে ওদের পয়সার বিনিময়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করত। এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনের এ আয়াত নাজিল করে তার মুখোশ উন্মোচন করে দেন,

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا،

তারা সতী থাকতে চাইলে, তোমরা পার্থিবজীবনের লোভ-লালসায় তোমাদের দাসীদের ব্যভিচারে বাধ্য করো না। [সুরা আন নুর : ৩৩]

এই আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের বংশধররাই এখন বলছে,

হিজাব তোমাকে আবদ্ধ করে রাখবে চার দেয়ালের মধ্যে। আর লম্বা বোরকা! সে তো অনেক ভারী ও বিরক্তিকর! প্যান্ট পরো। চলতে সুবিধা হবে। ওহ! চেহারা ঢেকে রাখতে কী কষ্ট? দম বন্ধ হয়ে আসে।

এরা এমন এক সম্প্রদায়, যারা বিধর্মীদের সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। আর এ সংস্কৃতির দিকে

এগিয়ে যাওয়ার জন্য তারা মনে করে হিজাব পরিহার ও কাপড় ওপরে তোলাই একমাত্র পথ। পাশ্চাত্যের কিংবা প্রাচ্যের কোনো দেশে কখনো সফরে গেলে এ বাস্তবতা তোমার সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে। কোথাও দেখবে, নারী বিমানবন্দরে কুলিগিরি করছে। কোথাও নারী একজন পরিচ্ছন্নকর্মী। কোথাওবা কোম্পানির অধীনে বাথরুম পরিষ্কার করছে। আর নারী একটু সুশ্রী হলে তাকে কাজে লাগানো হচ্ছে ভিন্নভাবে। বানানো হচ্ছে হয়তো নর্তকী, নয়তো 'কলগার্ল'। তাকে নিয়ে খেলছে মদ্যমাতাল একদল অমানুষ। চাহিদা পূরণ হয়ে গেলে কিংবা মূল্য কমে গেলে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে ডাস্টবিনে।

বলো, এ কি নারী স্বাধীনতা? এ কি নারীর সম্মান ও মর্যাদা? এর নাম কি নারীর অধিকার? যার শ্লোগানে মুখর পাশ্চাত্যসভ্যতার ধ্বজাধারীরা? ওই ফিলিস্তিনে কিংবা এই কাশ্মিরে কোনো মা-বোন নিপীড়িত হলে তুমি আমি একটু বেদনাক্রান্ত হলেও, সে দেশের নারী পায় কি তার পাশে কোনো বেদনার্ত হৃদয়কে?

তুমি কি সুন্দর চাও না!

মনে রাখবে, আল্লাহর নাফরমানি ও অসন্তোষের ভেতর নেই কোনো সৌন্দর্য। সৌন্দর্য শুধু আছে আল্লাহর বিধান পালনে। সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ তুমি এ পার্থিবজগতে পাবে না। পাবে জান্নাতে। পূর্ণরূপে, পূর্ণ ছবিতে, পূর্ণ অবয়বে। তখন তা দেখবে চোখ জুড়িয়ে। ভোগ করবে মন ভরিয়ে। জান্নাতের হুরদের কথা কি শোনোনি? এই হুরদের সঙ্গে তোমারও কিন্তু কোথাও কোথাও রয়েছে মিল। জানো সে কথা? হুরদের যদিও রাত জেগে ইবাদত করতে হয় না এবং দিবসে কষ্ট করে রোজা রাখতে হয় না;

কিন্তু তাদের নেই কোনো প্রবৃত্তির তাড়না। নেই কোনো যৌবনের উন্মাদনা। হুরদের পাশে রেখে এবার তুমি নিজেকে একটু বিশ্লেষণ করো! কত বিনিদ্র রাত কেটেছে তোমার, আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি ও স্তুতি-বন্দনায়। তিনি কি শুনেছেন তোমার অশ্রুসজল প্রার্থনা? দিয়েছেন কি তোমার কাতর ডাকে সাড়া?

হ্যাঁ, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তুমি ত্যাগ করেছ জীবনের আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস। প্রবৃত্তি তোমাকে ডেকেছে বারবার, প্রতিবারই তুমি সাফ বলে দিয়েছ, না! আমি সাড়া দেবো না! তোমার অবৈধ আহ্বানে!

বুঝলে কি? তুমি যে এখানে ত্যাগ করে জান্নাতের হুরকেও হার মানিয়ে দিলে? ওদের তো প্রবৃত্তিই নেই, তাহলে তাড়না আসবে কোত্থেকে? তোমার প্রবৃত্তি ছিল, ছিল আবেদন, লোভনীয় ফাঁদ, তবু তুমি বলে দিয়েছ– না! তাহলে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ! তুমিই তো সুন্দর! তুমিই তো রানি! জান্নাতের প্রবেশদ্বারে ফেরেশতারা তোমাকে যদি অভিবাদন জানায়, তাহলে কেন তুমি অবাক হবে?

وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٧٢﴾

আল্লাহ মুমিন নর-নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের, যার তলদেশে প্রবাহিত হবে ঝরনাধারা, যেখানে স্থায়ী হবে তারা। এবং তাদের জন্য উত্তম বাসস্থান হবে স্থায়ী জান্নাতের। আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ, সেটিই হবে মহাসাফল্য। [সুরা তওবা : ৭২]

তুমি তো রানি!

এক ডাক্তারের গল্প—

আমি বৃটেনে পড়াশোনা করতাম। আমার এক প্রতিবেশি ছিল। যার বয়স সত্তরের ওপর। যে-ই তাঁকে দেখে, তাঁর চোখেই সহানুভূতির আবেগ ঝরে। ন্যুজ হয়ে গেছে তাঁর পীঠ। নরম হয়ে গেছে হাড্ডি। শরীরের চামড়া ঝুলে পড়ছে। তবুও তিনি থাকতেন একা চার দেয়ালের ভেতর। দেখতাম তিনি কখনো রুম থেকে বের হচ্ছেন, কখনো প্রবেশ করছেন। সঙ্গে পরিবারের কেউ নেই।

নিজের খাবার নিজেই রান্না করেন। নিজের কাপড় নিজেই ধুয়ে নেন। যেন বাড়িতে এক ধরনের কবরের ছায়া। তিনি ছাড়া কারও আনাগোনা নেই। কেউ এসে তার দরজায় কড়া নাড়ছে না। এক বারের জন্যও তার কোনো সন্তান এসে বলে না,

মা! দুয়ার খোলো! আমি তোমার জন্য খাবার নিয়ে এসেছি! এসো বসে এক সঙ্গে খাই!

একদিন আমার স্ত্রী তাঁকে আমাদের বাসায় বেড়াতে অনুরোধ করে। তিনি আসেন। আমার স্ত্রী তাঁকে কথায় কথায় বলেন,

ইসলামে স্ত্রীর ভরণপোষণ ও দেখশুনের সব দায়িত্ব স্বামীর। স্ত্রীর আরামের জন্যই স্বামী বাইরে কাজ করেন। রুজিরোজগার করেন। তারপর উপার্জিত পয়সা দিয়ে খরিদ করেন স্ত্রীর খাবার ও পোশাক। স্ত্রী অসুস্থ হলে তাঁর উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এক কথায় স্ত্রীর প্রয়োজন ও সমস্যায় এগিয়ে আসার দায়িত্ব তাঁরই।

স্ত্রী ঘরে বসে ঘরের কাজ করবেন। আর স্ত্রীর ভরণপোষণ ও ইজ্জতআব্রু থেকে সবকিছুর হেফাজত করবেন

তাঁর স্বামী।

স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্ম নিলে সে সন্তানও বড় হয়ে মার আনুগত্য করতে বাধ্য। যদি তার কোনো সন্তান তাঁর সঙ্গে অন্যায় আচরণ করে, তাহলে ইসলাম তাকে বয়কট করার নির্দেশ দিয়েছে। যতক্ষণ না সে মায়ের আনুগত্যে ফিরে না আসবে সমাজের সবার সম্মুখে।

স্বামী না থাকলে নারীর যাবতীয় দায়িত্ব বর্তাবে তাঁর বাবা কিংবা ভাই কিংবা অভিভাবকের ওপর।

বৃদ্ধা মহিলা গভীর মনোযোগ দিয়ে আমার স্ত্রীর কথা শুনে। তাঁর চোখে-মুখে বিস্ময় ও মুগ্ধতার ছাপ খেলা করে। শুনতে শুনতে অশ্রু নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে । তাঁর মনে পড়ে যায় নিজের প্রিয় সন্তানদের কথা। নাতি-নাতনিদের কথা। যাদের তিনি দেখেন না অনেক দিন। এমন কি জানেনও না তারা আছে কোথায়? একদিন তিনি মারা যাবেন। তাঁকে দাফন করা হবে বা আগুনে পোড়ানো হবে। তখন কেউ তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাবে না। তাঁকে দেখতে আসবে না কেউ। শেষ বিদায়ও জানাতে আসবে না কেউ। তাঁর জন্য ফেলবে না একটু অশ্রুও কেউ। কাছে এসে বা দূরে বসে। কারণ, তাদের কাছে তাঁর কোনো মূল্য নেই। তিনি এখন একজন বৃদ্ধা, কাজের শক্তি নেই তাঁর।

আমার স্ত্রী তাঁর কথা শেষ করলে, বৃদ্ধা মহিলা কিছুক্ষণ নীরব হয়ে বসে থাকেন। তারপর মাথা তুলে বলে,

সত্যিই তোমাদের ধর্মে নারীরা রানি! হ্যাঁ, এই যে তুমি আমার সামনে বসে আছ, আমাকে তোমাদের গল্প বলছ, তুমিও একজন রানি! তোমার জন্য রক্ত দেওয়ার লোক আছে। তোমার সম্মান বাঁচানোর লোক আছে। তোমার এক প্রাণ বাঁচানোর জন্য শতপ্রাণ ও অঢেল সম্পদ বিলিয়ে দেওয়া তো কিছুই না! কারণ, তুমি রানি! সংরক্ষিত তোমার আসন ও অবস্থান। স্বামী বা ভাই বা কোনো অভিভাবক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাড়া

করে দাঁড়িয়ে আছে তোমার নিরাপত্তায়। ধন্য তুমি হে মুসলিম নারী! ধন্য তুমি হে মুকুটহীন সম্রাজ্ঞী!

সুরলহরী ও বেদনাপুঞ্জ

অনেক তরুণীকে শয়তান নিয়ে যায় পাপের পথে। গান-বাজনার অন্ধকার জগতে। আল্লাহ বলেন,

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴿ وَّ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا ، اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٦﴾

অনেক মানুষ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে [অন্যকে] বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য বিনিময় করে এবং আল্লাহর দেখানো পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।

[সুরা লোকমান : ৬]

ইবনে মাসউদ (রা.) কসম খেয়ে বলেছেন, لَهْوَ الْحَدِيْثِ অর্থ– গানবাজনা।

নবীকরিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

আমার উম্মতের একদল, স্বাধীন নারীকেও বাঁদীর মতো বৈধ মনে করবে। আরও বৈধ মনে করবে, রেশমি কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে।

[সহিহ বুখারি : ৫২৬৮]

তিরমিজি শরিফে বর্ণিত আছে,

এই উম্মতের ভেতরে জেঁকে বসবে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা, দোষারোপ ও বিকৃতি। যখন তারা অবাধে মদপান করবে, গায়িকা নিয়ে মেতে থাকবে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাবে।

[সুনানে তিরমিজি : ২২১২]

ওলামায়ে কেরাম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, বাদ্যযন্ত্র হারাম। বিশেষত বাজনা আর গান যখন এক সঙ্গে হবে, তখন মানুষের মধ্যে গুনাহ বেড়ে যাবে। আর গানের কথা যদি হয় অবৈধ-প্রণয়মুখী এবং নারীসৌন্দর্যের

বর্ণনা ও অশ্লীলতায় ভরপুর, তাহলে এমন গানকে ইসলামি শরিয়তে নিষেধ করা হয়েছে কঠোরভাবে। বলা হয়েছে, এটি শয়তানের বাজনা। শয়তান বাজায় আর অনুসারীরা শুনে শুনে লাফায়। আল্লাহ্ বলেন,

وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ اَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ

তাদের থেকে যাকে পারো ডেকে পদস্খলিত করো এবং তাদের আক্রমণ করো তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিকবাহিনী দিয়ে।

[সুরা ইসরা : ৬৪]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন,

গানবাজনা ব্যভিচারের জন্য সম্মোহনী শক্তি [তথা ব্যভিচারের প্রতি আকৃষ্ট ও প্রলুব্ধ করার মাধ্যম]।

আশ্চর্য! হজরত ইবনে মাসউদ (রা.) যখন এ কথা বলেছেন, তখন শুধু 'দফ' এর সাহায্যে গান করত দাসদাসীরা। কিন্তু এখনকার অবস্থা কী? এখনকার গানের ভাষা ও বাজনা অশ্লীলতার রকমারি বৈচিত্র্যে ভরপুর। পাশাপাশি চলে, গায়িকাদের রূপ প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা, শরীর প্রদর্শনের উদ্ভট মানসিকতা, এমন অবস্থা দেখলে এখন তিনি কী বলতেন?

হায়! এ পাপারাজ্জি এখন কী দাপটের সঙ্গেই না বিরাজ করছে! গাড়িতে, প্লেনে জলে-স্থলে সর্বত্র। এমন কি ঘড়িতে, ঘড়ির এলার্মে; শিশুখেলনায়, কম্পিউটারে এবং মুঠোফোনেও ঢুকে পড়েছে হরেক রকমের মিউজিকসংগীত।

সবচেয়ে বেদনাদায়ক বিষয় হলো এসব কর্মকাণ্ড মুসলমানদের নিকটও মূল্যায়িত হচ্ছে। তারা অবলীলায় বলছে,

আমাদের এখন সংস্কৃতির উন্নতি হয়েছে অনেক। আমরা অগ্রগতির কণ্টকাকীর্ণ বিশাল পথ মাড়িয়ে এসেছি এপর্যায়।

হায় আফসোস! হারাম ও অবৈধ জিনিসকে যখন অকপটে মুসলিম পরিচয়দানকারী মানুষেরা নিজেদের সংস্কৃতি বলে গর্ব করে, তখন কান্না ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না? আল্লাহ হারাম করেছেন, আর আল্লাহর বান্দা সেই হারামকেই ঘোষণা করছে, নিজের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। এরা কি সংস্কৃতি শুধু হারাম জিনিসেই খুঁজে পেল? হালাল জিনিসে পেল না? না না, এরা তো ভিন্ন এক মতলবে হারাম নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মঞ্চে তোলে নারীকে নাচায়। গাওয়ায়। দোলায়। কসরত করায়। ধিক, শতধিক এ সংস্কৃতির!

ব্যভিচারের সম্মোহনী শক্তি

সমাজে অশ্লীলতা ছড়ানো ও মানুষের কু-প্রবৃত্তিকে উসকে দেওয়ার বড় মাধ্যম হলো গান। অধিকাংশ গানের কথায় থাকে কী? শুধু প্রেম-ভালোবাসা। প্রেমের বেসামাল ডাকে সাড়া দিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া। এ ছাড়া তো আর কিছুই আমরা দেখি না। না হয় বলো তো! এমন কণ্ঠশিল্পী কজন পাবে তুমি! যারা ব্যভিচার কিংবা পরপুরুষ বা পরনারীর রূপ-দর্শন থেকে বেঁচে থাকার জন্য সতর্ক বা সাবধান করছে মানুষকে? কিংবা মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর হিফাজতের চেষ্টা করছে? রোজা রাখার জন্য মানুষকে করছে উদ্বুদ্ধ? আর রাতে অশ্রু ঝরিয়ে আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে বলছে তাঁর কথা? না, আমরা কখনো এমনটি দেখিনি। বরং এই কণ্ঠশিল্পীদের অধিকাংশই গানের

মাদকতা-ছড়ানো সুরসংগীতের মাধ্যমে এবং প্রবৃত্তিকে উসকে দেওয়া নাচের ঝংকারে তরুণ-তরুণীদের অবৈধ ভালোবাসার দিকে ঠেলে দেয়। মঞ্চে নৃত্যমাতাল অঙ্গভঙ্গি করে যুবক-যুবতীদের মাঝে অনৈতিকতার বীজবপণ করে। এতে তাদের হৃদয়ের সম্পর্ক হয় শয়তানের সঙ্গে। কখনো কখনো এ কণ্ঠশিল্পীরা এর চেয়েও ভয়ংকর বিপদের দিকে ওদের টেনে নিয়ে যায়। সেটা হলো সমকামিতা! নারীর সঙ্গে নারীর! নরের সঙ্গে নরের!

কেন ভালোবাসে এক নারী আরেক নারীকে?

এ জন্য নয় যে, তারা রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়বে। দিবসে রোজা রাখবে। বরং ভালো তো বাসে, রূপের-ঝলকে পাগল হয়ে। রূপ ঝরানো দিল ভোলানো হাসির জন্য। তার মোহনীয় অঙ্গভঙ্গির জন্য। তার অপরূপ চোখে চোখ রাখার জন্য। তার সঙ্গসুখের পাপবেষ্টনীতে সময় নষ্ট করার জন্য।

এসব বিষয়ে তরুণীরা এত বেশি উদার হয় কেন জানো? এ দাবি করার জন্য যে, দেহ আমার সিদ্ধান্ত আমার!

হ্যাঁ, বড় আশঙ্কাজনকহারে এমন নারীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই হাসতে হাসতে ভেঙ্গে পড়ছে। আবার কখনো চলতে চলতে

পরপুরুষের ওপর হুড়মুড়ি খেয়ে পড়ছে। মুখে হাস্যোজ্জ্বল আলংকারিক কথা। পায়ে দৃষ্টিকাড়া চপল-চলা। শরীরে লেপটে আছে আঁটসাট শর্ট জামা। এর সঙ্গে ওর সঙ্গে মানঅভিমান করা। কখনো গভীর ফিসফিসানি, দৃষ্টিকটু মাখামাখি। কখনো আবেগঘন চিঠির মাধ্যমে ভাববিনিময়। কখনো আবার উপহারবিনিময়। এসব এখন চোখে পড়ে সবখানেই। এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও। আদর্শ নাগরিক বানানোর কারখানাতেও। কেন ওরা এমন করে? অন্য মানুষের হৃদয়ে মুগ্ধতার আবেশ ছড়াতে? ছলনা করে মায়ায় জড়াতে? ভালোবাসার নামে অবলীলায় মেলামেশা করতে? নিঃসন্দেহে এসব আচরণ প্রবৃত্তি তাড়িত। এসব আচরণে নেমে আসে আসমানি গজব। যেমন এসেছে লুত সম্প্রদায়ের ওপর।

জানো কি লুত সম্প্রদায় কি করেছিল? এক পুরুষ আরেক পুরুষকে খুঁজেছিল। এক নারী আরেক নারীকে খুঁজেছিল। দেখ, কুরআনের ভাষায়,

اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾

তোমরা কি এমন অসৎকর্ম করছ, যা পৃথিবীতে তোমাদের পূর্বে আর কেউ করেনি! [সুরা আরাফ : ৮০]

এ ধরনের অসৎকর্ম যখন সংঘটিত হয়, তখন পৃথিবী প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। স্থানচ্যুত হয়ে যায় পর্বতমালা। লুত সম্প্রদায়কে এ অসৎ কর্মের জন্য যে ভয়াবহ শাস্তি আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, তা অন্য কোনো সম্প্রদায়কে দেননি। তাদের করে দেওয়া হয়েছিল অন্ধ। এবং মুখমণ্ডলকে করে দেওয়া হয়েছিল কালো। হজরত জিবরাইল (আ.) কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তাদের জনপদকে উল্টে দেওয়ার জন্য। মাটি-চাপা দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। তারপর সেখানে পাথরবৃষ্টি বর্ষণ করার জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ، مَّنْضُوْدٍ ﴿٨٢﴾
অতঃপর যখন আমার আদেশ এল, তখন আমি জনপদকে উল্টে দিলাম এবং তাদের ওপর ক্রমাগত প্রস্তরকঙ্কর বর্ষণ করলাম।

[সুরা হুদ : ৮২]

লুত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ওপর এ শাস্তিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ভূপৃষ্ঠবাসীর জন্য নিদর্শন, মুত্তাকিদের জন্য শিক্ষণীয় এবং অপরাধীদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড বানিয়েছেন। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন। এ বিপদ যখন তাদের গ্রাস করে, তখন তারা ছিল ঘুমন্ত জগতের বাসিন্দা। তাদের এ অস্থায়ী ঘুম রূপ নিল স্থায়ীতে। জীবনের কোনো অর্জনই তখন তাদের কোনো কাজে এল না। নিমিষেই চলে গেল সব ভোগবিলাস। অসৎপ্রবৃত্তির অবাধ স্বাধীনতায় এখন তাদের সকালও কাটে না, সন্ধ্যাও কাটে না। সামনে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। আজাব আর আজাব।

অনুশোচনা! কোনো কাজে আসবে না এখন। কান্না! কোনো কাজে আসবে না এখন। এখন তাদের ঝলসানো হবে জাহান্নামের আগুনে। তাদের নাক-মুখ দিয়ে বের হবে জাহান্নামের আগুন! তাদের বাধ্য করা হবে জাহান্নামের দুর্গন্ধযুক্ত পানীয় পান করতে। তাদের বলা হবে,

স্বাদআস্বাদন করো সেটার, যেটা পার্থিব জগতে তোমরা অর্জন করেছিলে।

জাহান্নামে প্রবেশ করো! যাও তোমাদেরকে তোমাদেরই কর্মফল আজ ভোগ করতে হবে।

এ কর্মফল জালিমদের কাছ থেকে বেশি দূরে নয়।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِيْ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ.

আমি আমার উম্মতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা করি লুতসম্প্রদায়ের কুকর্মের ব্যাপারে! [তিরমিজি : ১৪৫৭]

আরেক হাদিসে তিনি বলেছেন,

لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ...
لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ...
لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ.

যে ব্যক্তি লুতসম্প্রদায়ের অপকর্মে লিপ্ত হয়, তার ওপর আল্লাহর 'লানত'। যে ব্যক্তি লুতসম্প্রদায়ের অপকর্মে লিপ্ত হয়, তার ওপর আল্লাহর 'লানত'। যে ব্যক্তি লুত সম্প্রদায়ের অপকর্মে লিপ্ত হয়, তার ওপর আল্লাহর 'লানত'। [সহিহ ইবনে হিব্বান]

অন্যত্র বলেন,

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْهُ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ.

লুতসম্প্রদায়ের অপকর্মে তোমরা যাকে দেখতে পাবে, তাকে ও যার সঙ্গে সে এ কাজ করেছে উভয়কে হত্যা করো। [মুসনাদে আহমাদ]

সাহাবায়েকেরাম সমকামীদের পুড়িয়ে শাস্তি দিতেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

সমকামী তওবা ছাড়া মারা গেলে কবরে শুকুরে পরিণত হবে।

অতএব যারা এ অসৎকর্ম করে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছেন, তারা তওবা ইস্তেগফার করে এক্ষুনি পরিশুদ্ধ নতুনজীবনে ফিরে যান। আশা করি আল্লাহ ফিরিয়ে দেবেন না। তাঁর ক্ষমা থেকে নিরাশ হতে তিনি নিষেধ করেছেন। মনে রাখতে হবে, যেমন তিনি পরাক্রমশালী, তেমনি তিনি গাফফারও।

হে নারী বিশেষভাবে আমি তোমাকে তওবা করার আহ্বান জানাচ্ছি। তওবা করো আল্লাহর কাছে। কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেল ওদের সমস্ত চিঠি ও নম্বর। ধ্বংস করে দাও পাপারাজ্জির সব ছবি, ক্যাসেট ও ভিডিও অডিও। হয়ে যাও তুমি একমাত্র আল্লাহর জন্য। অন্য কারও জন্য নয়। তোমার ভালোবাসা হোক শুধু আল্লাহর জন্য। তোমার আনুগত্য হোক শুধু আল্লাহর জন্য। সাবধান! মনে রাখবে, কখনো যেন শয়তানের প্ররোচণায় পড়ে অন্যের জন্য ভালোবাসা না হয়ে যায়।

কোথায় সেই অসহায় নারী!

কুরআনের তেলাওয়াত শুনতে যার মন চায় না, কিন্তু গান-বাজনায় মন থাকে সর্বক্ষণ ব্যস্ত । তাকে আমি বলব, আল্লাহর আজাব তোমাকে অচিরেই গ্রাস করবে। জান্নাতে গিয়ে গান শোনার সৌভাগ্য থেকেও হবে বঞ্চিত তুমি!

কুরআনের তেলাওয়াতের পরিবর্তে গান-বাজনায় মত্তথাকা বড় গর্হিত কাজ। মুহাম্মাদ ইবনে আল মুনকাদির বলেন,

কেয়ামতের দিন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, কোথায় ওরা! যারা গান-বাজনা ও বিনোদনের আসর থেকে নিজেদের কানকে বাঁচিয়ে রেখেছিল? ওদের ঠিকানাকে আজ মেশক-আম্বরের উদ্যানে গড়ে দাও।

এরপর ফেরেশতাদের আল্লাহ বলবেন, ওদের শুনাও আমার মহিমা ও স্তুতিগান।

শাহর ইবনে হাওশাব থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের বলবেন, আমার বান্দারা পৃথিবীতে মিষ্টি কণ্ঠ ভালোবাসত। আমাকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্তে আমার স্তুতি-গাওয়া কথা ও বাণী শুনত। আজ তোমরাও আমার মহিমাগাথা স্তুতিগান তাদের শুনাও।

তখন ফেরেশতারা সুরলিত কণ্ঠে আল্লাহর মহিমাকীর্তন ও স্তুতিগানে পুরো আবহকে মুখরিত করে তুলবে। এমন কণ্ঠে, এমন সুরে, যা কোনোদিন তারা কোথাও শুনেনি।

রাখে আল্লাহ্ মারে কে!

প্রিয় বোন! যখন আমি এসব লিখছি, তখন আমি নিশ্চিতভাবেই ধরে নিচ্ছি, তুমি এসব কর্ম থেকে মুক্ত ও পবিত্র। আমি জানি, তুমি গান শোনো না। আমি জানি, তুমি অশ্লীল কাজে লিপ্ত হও না। তবে তোমাকেই বলছি, যেন তুমি অন্যকে বলতে পারো। অন্যকে ফিরিয়ে আনতে পারো। যাতে সৎকর্মের নির্দেশনা দিতে পারো। অন্যায় কর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে বাধা দিতে পারো। যেন তুমি হতে পারো, একজন বীরাঙ্গনা। শয়তান কখনো যেন তোমার কাছে ভিড়তে না পারে। এবার আরেক নারীর বীরত্বের কাহিনি শোনো–

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক ফুপির নাম ছিল সাফিয়্যা (রা.)। তিনি ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছিলেন। কাহিনিটি খন্দক যুদ্ধের। তখন হজরত সাফিয়্যা (রা.)-এর বয়স ষাট ছাড়িয়ে গেছে। তখনও তিনি বিস্ময়কর বীরত্বগাথা এক নায়িকা।

আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সম্মিলিত আরববাহিনী মদিনা ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য ঘিরে ফেলেছে পুরো মদিনা। ওদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে সাহাবায়েকেরাম পরিখা খনন করেন অরক্ষিত মদিনার পাশগুলোতে। মুসলমানরা ছিলেন জনবলে হীনবল। তাই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিখার তীরে সকল সাহাবিকে হাজির থাকার নির্দেশ দেন। যাতে পরিখাভেদ করে দুশমনদের মদিনা প্রবেশের ব্যর্থ চেষ্টাকে করে দেওয়া যায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ।

মহিলা ও শিশুদের নবীজি মজবুত এক কেল্লায় জড়ো করলেন। কিন্তু লোকবলের অভাবে কোনো পুরুষ-পাহাড়াদার সেখানে বসানো সম্ভব হয়নি। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

যখন সাহাবিদের নিয়ে পরিখার নিকট যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন একদল ইহুদি অন্য এক পাশ দিয়ে গোপনে চলে আসে দুর্গের একেবারে নিকটে। মহিলাদের অবস্থানের কাছাকাছি। কিন্তু দুর্গের ভেতর প্রবেশ করার সাহস পায় না, পুরুষ থাকার আশঙ্কায়। তবে দুর্গের বাইরে তারা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ায়। একজনকে ভেতরের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করে। প্রেরিত ইহুদি দুর্গের আশপাশে ঘুরতে থাকে। হঠাৎ একটা ছোট্ট সুড়ঙ্গ পেয়ে সে ভেতরে ঢুকে যায়। ভেতরে ঢুকে সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকায়।

সাফিয়্যা (রা.) দেখে ফেলেন তাকে। আতঙ্কিত হন। কিন্তু মনে মনে ভাবেন, এ ইহুদি কীভাবে যেন কেল্লায় ঢুকে পড়েছে! চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে ওর উদ্দেশ্য খারাপ। আমার ইচ্ছা নয়, এখান থেকে সে ফিরে গিয়ে অন্য ইহুদিদের সামনে আমাদের সম্পর্কে তাদের সে জ্ঞাত করুক। আমাদের মাঝে নেই কোনো পুরুষ। সবাই পরিখার পাড়ে যুদ্ধে ব্যস্ত। এ অবস্থায় আমি যদি নিজে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যাই এবং চিৎকার দিই, তাহলে বিপদ দুটি। একটি, নারী ও শিশুদের কাছে গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে। শুরু করে দেবে তারা চিৎকারচেঁচামেচি।

দ্বিতীয়টি, ইহুদিও বুঝে ফেলবে, দুর্গে কোনো পুরুষ নেই, তাহলে বিপদ আরও ঘনীভূত হবে।

সাফিয়্যা (রা.) এসব ভাবতে ভাবতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। একটা ধারালো ছুরি নিয়ে বাঁধলেন দেহের সঙ্গে। এরপর গাছের একটা লম্বা ডাল নিলেন। তারপর অগ্রসর হতে থাকলেন ইহুদির দিকে। এবং চলে

গেলেন একেবারে নিকটে। তারপর সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে থাকলেন আড়ালে। সুযোগ মতো সজোরে হানলেন আঘাত। ইহুদি হয়ে গেল ধরাশায়ী! আঘাত লেগেছিল মাথার মধ্যখানে। তাই দম বের হতে আর সময় লাগে না!

হে সাফিয়্যা!

হে মহীয়সী নারী!

ধন্য তুমি ধন্য!

পৃথিবীর নারীদের জন্য আপনি ত্যাগের যে নমুনা রেখে গেলেন। বীরত্বের যে মহিমা রেখে গেলেন। চিরকাল তা মুসলিম নারীদের দেখাবে আলোর পথ । ত্যাগের পথ।

বলো, মহীয়সী সাফিয়্যা (রা.)-র কাহিনি থেকে তুমি কী পেলে? কী শিখলে? এবার মনকে প্রশ্ন করো, বলো–

হে মন! দীনের জন্য তুমি কী করেছ? কী কী কষ্টে পতিত হয়েছ? ব্যয় করেছ কী কী? কখনো কি দিয়েছ রক্তের নাজরানা?

কত সময় সৎ কাজের আদেশে কাটিয়েছ? নাকি নাফরমানিতেই জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁছেছ? ওই যে রাস্তায় হেঁটে যেতে দেখছ, সরু-ভ্রূ-নারীদের, কিংবা মার্কেটে মার্কেটে ঘুরে বেড়াতে দেখছ, স্বল্প-ভূষণা বে-আব্রুদের, কিংবা বিবাহ অনুষ্ঠানে নগ্নবস্ত্রে আসা এই

যুবতীদের, তখন তোমার দায়িত্ব কি আদায় করেছ তুমি?

তাদের প্রতি তোমার দায়িত্ব কি পালন করেছ তুমি?

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ ؕ اِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۷۱﴾

মুমিন নর-নারীরা একে অপরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ দেয়। এবং অসৎ কাজের নিষেধ করে। সালাত কায়েম করে, জাকাত আদায় করে। আল্লাহ এবং রসুলের আনুগত্য করে। তাদেরই করবেন ক্ষমা আল্লাহ। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। [সুরা তওবা : ৭১]

সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজের নিষেধ যারা পরিত্যাগ করে, তাদের ওপর আল্লাহ অভিসম্পাত করেন এভাবে,

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۷۸﴾ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿۷۹﴾

বনি ইসরাইলের মধ্যে যারা কুফুরি করেছে, তারা দাউদ ও মরইয়াম তনয়কর্তৃক হয়েছে অভিশপ্ত। কারণ, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করে, তা থেকে একে অন্যকে বারণ করে না। তারা যা করে তা কতই না নিকৃষ্ট! [সুরা মায়েদা : ৭৮]

দাওয়াতের ময়দানে কাজ করতে নেমে লজ্জাবোধ কেন করো? দাওয়াতের ময়দানের সূচনায় ত্যাগ ও কষ্ট থাকলেও শেষটা বড় আনন্দের ও উপভোগের। জ্বলতে জ্বলতে আর পুড়তে পুড়তেই হয় খাঁটি সোনা, তখনই পাওয়া যায় অনাবিল সেই স্বাদ ও আনন্দ।

যতই আসুক বাধা, আমি কিন্তু থাকব ইমানের সঙ্গে বাঁধা। যখন ইমান রক্ষার জিহাদে রক্তস্নাতের ডাক আসবে, তখন আমি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলব, আমি হাজির।

এ মনোভাব ও চেতনায় যেসব নারী লালিত, তারাই ধন্য! এমন নারী ইসলামের ইতিহাসে অসংখ্য। আমরা এখন এমন একজনের কথা আলোচনা করব, যিনি ছিলেন একজন সুনামধন্য সাহাবি–

নাম ছিল তাঁর জোলাইবিব। দেখতে খুব একটা সুদর্শন ছিলেন না। তুমি যদি সুদর্শন বলো, তবে তাঁকে ঠিক তার উল্টো বলতে হবে। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। তখন হজরত জোলাইবিব (রা.) বললেন,

হে আল্লাহর রসুল! যদি দেখতে পান, কেউ আমাকে পছন্দই করছে না! তাহলে কী করবেন?

উত্তরে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আরে আল্লাহর নিকট তো আর তুমি কুশ্রী নও, বরং সুশ্রী।

এরপর থেকেই আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত জোলাইবিব (রা.) কে বিবাহ করানোর জন্য ভালো কোনো পাত্রীর খোঁজে ছিলেন। একদিন তাঁর খিদমতে আনসার এক সাহাবি এসে তাঁর মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য বললেন, তখন আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

তোমার মেয়েকে আমার কাছে বিবাহ দিয়ে দাও!

সাহাবি আনন্দিত হয়ে বললেন,

হে আল্লাহর রসুল!

আমি এতে খুবই আনন্দিত।

এরপর আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

না না, আমি তো আমার জন্য বলছি না।

এরপর সাহাবি বললেন,

তাহলে কার জন্য বলছেন হে আল্লাহর রসুল!

জোলাইবিবের জন্য।

জোলাইবিব! তাহলে আমি মেয়ের মায়ের সঙ্গে একটু পরামর্শ করে আপনাকে জানাব ইনশাআল্লাহ!

সাহাবি স্ত্রীর কাছে এসে বললেন,

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন।

স্ত্রী বলেন,

উত্তম প্রস্তাব! এ প্রস্তাবে অবশ্যই আমাদের সাড়া দেওয়া উচিত।

স্বামী বললেন, না না।

তিনি তো নিজের জন্য নয়; অন্যের জন্য দিয়েছেন।

কার জন্য?

জোলাইবিবের জন্য।

কী! জোলাইবিবের জন্য! না, এতে আমি রাজি নই। আমি জোলাইবিবের কাছে আমার মেয়েকে বিবাহ দিব না।

মেয়ের পিতা মায়ের অমতে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে যান এবং চিন্তিতাবস্থায় আল্লাহর নবীকে স্ত্রীর অমত জানাতে উঠে দাঁড়ান। তখন মেয়েটি পর্দার আড়াল থেকে উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে,

আপনাদের নিকট কে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন?

তারা বলে,

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আপনারা আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে যাচ্ছেন? এটা কিছুতেই হতে পারে না। আমাকে নিয়ে চলুন রসুলের দরবারে! আমার বিশ্বাস তিনি আমার কোনো অমঙ্গল করবেন না।

তখন বাবা একা যান নবীজির কাছে। বললেন, তাঁকে নিজের কথা, মেয়ের কথা ও মেয়ের স্পষ্ট উচ্চারণের কথা। আল্লাহর নবী খুব খুশি হন এবং তাঁকে জোলাইবিবের সঙ্গে বিবাহ পড়িয়ে দেন। নব-দম্পতির জন্য মঙ্গল ও কল্যাণের দোয়া করেন। বলেন,

اَللّٰهُمَّ صَبِّ عَلَيْهِمَا الْخَيْرَ صَبًّا...وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهُمَا كَدًّا.

হে আল্লাহ! এদের দাম্পত্যজীবনকে সুখময় করো। কষ্টঘেরা করো না।

বিবাহ হয়েছে মাত্র কয়েকদিন। অমনি জিহাদের ডাক আসে। আল্লাহর রসুলের সঙ্গে বের হয়ে যান জোলাইবিবও। যুদ্ধশেষে যখন খোঁজ নেওয়া হয়, তখন অনেককেই পাওয়া যায় না। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন,

সবাইকে তোমরা খুঁজে পেয়েছ তো?

নবীজির পবিত্র রসনায় আবার ধ্বনিত হয় একই জিজ্ঞাসা।

এবার বলেন,

আমি যে জোলাইবিবকে দেখছি না?

তখন সবাই এক সঙ্গে তাঁকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু পুরো যুদ্ধক্ষেত্র খুঁজেও তাঁরা কোথাও জোলাইবিবের খোঁজ পান না। অবশেষে অনেক পরে শহিদ অবস্থায় তাঁকে পাওয়া যায়। পাশে পড়ে আছে সাতজন কাফেরের লাশ! বোঝাই যাচ্ছে, তিনি বীরবিক্রমে লড়তে লড়তে সাত মুশরিককে জাহান্নামে পাঠিয়ে নিজেও পান করেছেন শাহাদাতের অমীয় সুধা! আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান। এবং বলেন,

ও সাতজনকে হত্যা করেছে, তারপর শহিদ হয়েছে। ও সাতজনকে নিজে হত্যা করেছে, তারপর নিজে শহিদ হয়েছে। ও আমার, আমি ওর।

এরপর আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁকে কাঁধে তুলে নিলেন এবং সাহাবায়েকেরামকে একটি কবর খননের নির্দেশ দিলেন।

আনাস (রা.) বলেন,

আমরা কবর খনন করতে থাকি আর জোলাইবিব খাটে শুয়ে থাকেন। খাটটি ছিল রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই হস্তের। খনন শেষে তিনি জোলাইবিবকে কবরে শুইয়ে দেন।

আনাস (রা.) আরও বলেন,

আনসারদের ভেতর জোলাইবিবের স্ত্রীর চেয়ে অধিক দানশীলা মহিলা আরেকজন ছিলেন না। জোলাইবিবের শাহাদতের পর অনেকেই বিধবাপত্নীর নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠায়।

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقِيْهِ فَأُوْلَائِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ.

যারা আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে, তারাই সফলকাম।

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَى.

আমার পুরো উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যারা অস্বীকার করবে [তারা নয়]। সাহাবায়েকেরাম আরজ করলেন, কারা অস্বীকার করবে হে আল্লাহর রসুল! তিনি বললেন, যারা আমার আনুগত্য করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যারা আমার অবাধ্য হবে, তারাই অস্বীকারকারী বলে গণ্য হবে। [সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৭২৮০]

পথ দুটি : কোনটি গ্রহণ করবে তুমি?

হে মহীয়সী নারী! কোথায় তুমি! আল্লাহ এবং তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা যার নেশা ও পেশা! আর তোমার মতো কজন পারবে নফসের ওপর আল্লাহ ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশকে প্রাধান্য দিতে? যখনই তোমার সামনে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্যের প্রশ্ন এসেছে, তখনই তুমি সেটাকে দিয়েছ প্রধান্য । তোমার বান্ধবীরা তোমাকে বলেছে,

তুই এত সেকেলে কেন? আমাদের সঙ্গে আয়। চল বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই! মজা করি! আড্ডা মারি!

আর তুমি বলেছ,

কাল্লা। অসম্ভব। কক্ষনো নয়।

আবু দাউদ শরিফে আম্মাজান আয়শা (রা.)-র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে,

আল্লাহর কসম! আল্লাহর কিতাবকে সত্যায়িত করা ও ওহিকে বিশ্বাস

করার ক্ষেত্রে আনসার নারীদের চেয়ে উত্তম নারী আমার চোখে আর কেউ পড়েনি। আল্লাহ সুরা নুর-এ যখন হিজাবের আয়াত অবতীর্ণ করেন এবং তা পুরুষেরা যখন নারীদের নিকট পৌঁছে দেন। স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী, বাবার কাছ থেকে মেয়ে, ভাইয়ের কাছ থেকে বোন এবং আত্মীয়র কাছ থেকে আত্মীয় শুনতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পালনে সবাই ছুটোছুটি শুরু করে। কেউ ওড়না দিয়ে মাথা ঢাকে, কেউ পেটিকোটের কাপড় কেটে মাথা ঢাকে। তথা যার কাছে ওড়না বা অবগুণ্ঠনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, তারও আর তর সইল না, পেটিকোট বা দেহের নিম্নাংশের পরিধেয় বস্ত্র দিয়েই বানিয়ে নেয় ওড়না। ঢেকে নেয় মুখমণ্ডল। কেন এ তাড়াহুড়া? হ্যাঁ, তাড়াহুড়া আল্লাহর কিতাবের প্রতি বিশ্বাসের কারণে। তাঁর হুকুম পালনে ব্যাকুল হওয়ার কারণে।

আয়শা (রা.) আরও বলেন,

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এরপর থেকে মহিলারা আসত অবগুণ্ঠিত হয়ে। যেন তাঁদের মাথায় কাক বসে আছে।

আল্লাহু আকবার! এ ছিল সেই যুগের মহিলাদের অবস্থা, যখন পর্দার ডাক এসেছে, তখন আমলের জন্য তাঁরা প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। নিজেদের রূপ-লাবণ্য আড়াল করার জন্য তারা এমনভাবে অবগুণ্ঠিত হয়েছেন, যাতে তাঁদের কোনো রূপের ঝলক পরপুরুষের সামনে প্রকাশ না হয়।

হে একবিংশ শতাব্দির নারীরা!

তখন যেসব নারীদের হিজাবের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ভেবে

দেখেছ কি, তারা ছিল কারা? একজন ছিলেন উম্মুল মুমিনীন আয়শা সিদ্দিকা (রা.)! আরেকজন ছিলেন নবী-নন্দিনী ফাতেমা (রা.)! আবু বকর তনয়া আসমা (রা.)! এ ছাড়া আরও পুণ্যবতী অনেক সাহাবিয়্যাহও (রা.)!

বলো দেখি, কার কাছ থেকে তাঁদের রূপসৌন্দর্য আড়াল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল? তাঁরা ছিলেন কেমন পুরুষ? তাঁরা ছিলেন সোনার মানুষ! একজন আবু বকর (রা.)! আরেকজন ওমর (রা.)! একজন উসমান (রা.)! আরেকজন আলি (রা.)! এ ছাড়া আরও পুণ্যবান অনেক সাহাবায়েকেরাম (রা.)! সবাই ছিলেন এ উ[illegible]তের পবিত্রতম ও পরিচ্ছন্ন মানুষ।

সৎ ও শুভ্র চরিত্রের অধিকারী মানুষের সমাজেও আল্লাহ নারীদের হিজাবে আবৃত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সমাজের সততা ও শুভ্রতার পথের সকল কাঁটা যাতে দূর হয়ে যায়। কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন আবু বকর, ওমর, তলহা ও যোবায়েরসহ সকল সাহাবিকে, যেন তাঁরা নারীদের সঙ্গে উঠ-বস না করেন!

বলেছেন,

إِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ
وَّرَآءِ حِجَابٍ، ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَ قُلُوْبِهِنَّ،

তোমরা তাঁর [নবী] পত্নীদের কাছে [যাঁরা সতীত্ব ও নৈতিকতায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী] কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। কেননা, এ বিধান তোমাদের ও তাঁদের হৃদয়কে অধিকতর পবিত্র রাখবে। [সুরা আহজাব : ৫৩]

এই নষ্ট যুগের নারী-পুরুষের জন্য তাহলে এই হিজাবের বিধান রক্ষা
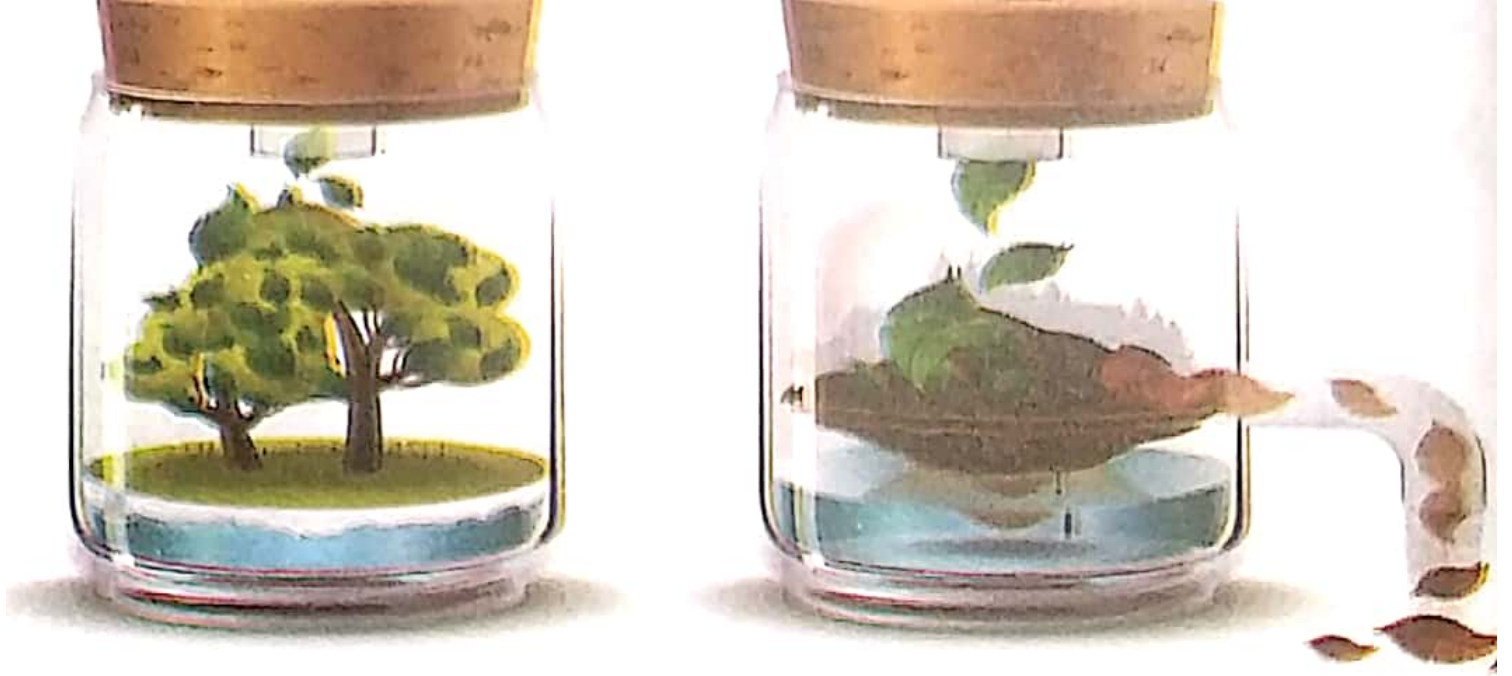
করা এবং তা মেনে চলা কত জরুরি? কী বলবে তুমি ওইসব নারী সম্পর্কে? যারা হিজাব পরে মার্কেটে গিয়ে পুরুষ বিক্রেতার সঙ্গে অবলীলায় কথা বলে? যেন কথা বলছে নিজের স্বামীর সঙ্গে কিংবা ভাইয়ের সঙ্গে? মাঝে মধ্যে দেখা যায় এই আলাপে নারী, পুরুষ কলকলিয়ে হেসে ওঠে, কখনো কৌতূক করে মূল্যহ্রাসের জন্য। হায় আফসোস!

কী বলবে ওই নারী সম্পর্কে, যে একাকী চালকের সঙ্গে বেরিয়ে যায়? অথচ নারী-পুরুষ একাকী হলেই শয়তান তাদের মাঝে অবস্থান করে।

এসব যে পাপ, ভালো করেই জানে এসব তথাকথিত আধুনিকারা। কিন্তু তারপরও তারা পাপের পথে পা বাড়ায়। আল্লাহর নেয়ামতের না-শুকরি করে। আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামতের ছায়ায় বসবাস করেও দেখায় ধৃষ্টতা। এদের ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণে মনে হয়, আল্লাহ যেন এদের শাস্তি দিতে 'অক্ষম'! কিংবা আল্লাহ যেন 'না জেনে না বোঝেই' ওদের পর্দা করতে বলেছেন! অন্যথা অনেক বাচাল নারী কোন সাহসে বলে?

ভল্লুকমার্কা পর্দা বর্তমানে চলে না! পর্দার সঙ্গে কিছুটা আধুনিকতার ছোঁয়া ও ফ্যাশনের পরশ থাকা চাই!

কীভাবে এত ধৃষ্টতা দেখায় এরা?

আল্লাহর নেয়ামতের কথা শুনবে? তাহলে হাসপাতালে গিয়ে দেখ, সুস্থতা হারিয়ে কত মানুষ সেখানে মরণযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তোমার মতো কত মেয়ে শুয়ে আছে হাসপাতালের সাদা বিছানায়। পাঞ্জা লড়ছে মৃত্যুর সঙ্গে। অথচ কতইবা তাদের বয়স? বেশি হবে না তোমার চেয়ে! জীবনের এই বসন্তকালে আসতে হয়েছে এখানে তাঁদের! একটু ভাবো। হাসপাতালের ওই রোগী তারা না হয়ে, যদি তুমি হতে!

আরও ভাবো, তাদের অবস্থা নিয়ে, যাদের নড়াচড়া করার কোনো ক্ষমতা নেই। নিথর দেহ পড়ে আছে বিছানায়। নড়ছে শুধু মাথাটা একটু একটু করে। চোখও কখনো কখনো কথা বলছে। বাকি দেহে কোনো চেতনা নেই। হাত-পা কেটে ফেললেও সে বুঝতে পারছে না, কী ঘটছে।

আল্লাহর দরবারে ওদের সুস্থতার জন্য আমরা দোয়া করি। দুনিয়ার এ কষ্টভোগের যেন বিনিময় তিনি তাঁদের দান করেন পরকালে। আহা! কী করুণ অবস্থা তাঁদের! চোখে-মুখে বেঁচে থাকার আকুতি টপ টপ করছে! কারও কারও আটকে আছে পেশাব-পাখয়না। মনে-প্রাণে চাচ্ছে তাঁরা স্বাভাবিকভাবে যদি একটু পেশাব বের হতো! পায়খানা হচ্ছে না! আরে পায়খানা না হওয়ার কারণে তো মৃত্যু হবে! আহা! কী করুণ সে মৃত্যু! এরচেয়েও করুণ বেহুঁশ পড়ে থাকা বিছানায়! কখন যে পেশাব-পায়খানা হয়ে বিছানা ভরে যাচ্ছে, তারও কোনো খবর নেই! শিশুদের মতোই তাদের পেম্পাস পরিয়ে রাখা হয়েছে! মাঝে মধ্যে এই পেম্পাস পরানো থাকে তিনদিন/চারদিন অ[illegible]ন্ন অবস্থায়! খুলে পরিচ্ছন্ন করার কেউ থাকে না। একদিন এরা তোমার মতোই ছিল। খেত-হাসত। আনন্দ-উল্লাসে বয়ে যেত তাদের বেলা। মার্কেটে যেতে ছিল না কোনো মানা। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে ছিল না কোনো বাধা। হঠাৎ আলো হয়ে যায়

অন্ধকার। রাঙা প্রভাত হয়ে যায় কৃষ্ণসন্ধ্যা। সুখের চাদরে নেমে আসে দুঃখের বৃষ্টি। কেউ জীবন হারায় গাড়ির নীচে! কেউ মারা যায় উচ্চরক্ত চাপে! কেউ চলে যায় হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে! জীবিত মানুষটি এখন মরা লাশ! একদিন সে ছিল জীবিত মানুষ। একটা নাম ছিল তাঁর। আজ সে হলো মরা লাশ!

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَ اَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ﴿٤٦﴾ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٧﴾

বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছ! আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণ-শক্তি ও দৃষ্টি-শক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের হৃদয়ে মোহর মেরেদেন, তাহলে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের আর কোন ইলাহ আছে, যে তোমাদের এগুলো ফিরিয়ে দেবেন? দেখ, কীভাবে আমি বিশদভাবে আয়াতের বর্ণনা দিই, তারপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। বলো, তোমরা কি ভেবেছ! যদি তোমাদের ওপর আল্লাহ তাআলার আজাব হঠাৎ, অকস্মাৎ কিংবা সময় নিয়ে প্রকাশমানাবস্থায় আপতিত হয়! মনে রাখবে, তাহলে উভয় অবস্থাতেই জালেমসম্প্রদায় ছাড়া, অন্য কেউ কি ধ্বংস হবে?

[সুরা আনআম : ৪৬-৪৭]

শোনো, সব অসুস্থতাই অসুস্থতা নয়। কিছু কিছু অসুস্থতা আল্লাহর শাস্তি ও প্রতিদান। কিন্তু আফসোস! অনেকেই বুঝতে পারে না। শিক্ষা নেয় না। মুমিন নারী ছোটবড় সব পুণ্যের কাজেই প্রতিযোগিতা করে। প্রতিটি ময়দানেই তাদের অবদান থাকে। জানো কি? কোন কাজ তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে?

এমনও তো হতে পারে যে, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তুমি একটা ওয়াজ-নসিহতের ক্যাসেট দিয়ে এলে, অথবা কাউকে কোনো ভালোকাজের পরামর্শ দিলে, আর আল্লাহ এ কারণেই তোমায় ক্ষমা করে তোমার জন্য জান্নাতের ফয়সালা করে দিবেন! এমন কি হতে পারে না! হ্যাঁ, অবশ্যই হতে পারে। অসম্ভব নয়। সম্ভব। সবই সম্ভব।

পতিতা যখন জান্নাতে!

বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত, বনি ইসরাইল গোত্রের এক ব্যভিচারিনী মহিলা কোনো এক মরুভূমির পথ দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছিল। হঠাৎ সে দূর থেকে তৃষ্ণায় কাতর এক কুকুরকে কূপের পাশে ঘুরতে দেখে। এ দৃশ্যে সে থমকে দাঁড়ায়। এবং নিকটে যায়। অতঃপর দেখে, সেই কুকুর একবার কূপের পাড়ে ওঠে, আবার নামে; কিন্তু কোনোভাবেই সে তার তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে না। আবার কিছু সময় কূপের চার পাশে ঘুরতে থাকে, আবার পাড়ে ওঠে; কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণ হয় না তার। সময়ও ছিল চৈত্রসংক্রান্তির। প্রচণ্ড দাপদাহে একপর্যায় তৃষ্ণায় কুকুরের জিব ভেতর থেকে বের হয়ে আসে। একসময় ব্যভিচারিনী দেখল, তৃষ্ণাজ্বালা যেন তাকে মৃত্যুর দুয়ারে নিয়ে যাচ্ছে।

ওই ব্যভিচারিনী ছিল বিধাতার অবাধ্য। অন্যকে গুনাহের দিকে আহ্বানকারী। অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকা এক নারী। হারাম উপার্জন ভক্ষণকারিনী। কিন্তু সে যখন তৃষ্ণায়কাতর এক কুকুরকে দেখতে পায়। তখন তার বিবেক নাড়া দিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের পায়ের মুজা [বা জুতা] খুলে দোপাট্টার সঙ্গে বেঁধে কূপ থেকে পানি উঠিয়ে সেই তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পান করায়। শুধু এ কারণেই দয়াময় প্রভু

আল্লাহ ওই মহিলাকে ক্ষমা করে দেন।

আল্লাহু আকবার! বিধতা এ মহিলাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

কিন্তু কেন? সে কি কোনো ইবাদতগুজার ছিল? তাহাজ্জুদগুজার কিংবা কোনো রোজাদার ছিল? নাকি আল্লাহর পথে তাঁর শহিদ হওয়ার আকাঙ্খা ছিল? না না, এমন কিছুই নয়; বরং সে শুধু একটি কুকুরকে সামান্য পানি পান করিয়েছে। যার কারণে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

খেজুর বনাম জান্নাত!

মুসলিম শরিফে বর্ণিত। একদিন উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়শা ছিদ্দিকা (রা.)-র নিকট এক অসহায় মহিলা দুই মেয়েকে নিয়ে হাজির। বলে,

তিনদিন ধরে না খেয়ে আছি। আপনার নিকট কিছু থাকলে আমাদের দিন।

আয়শা (রা.) গৃহে খুঁজে মাত্র তিনটি খেজুর পান। তাই এনে মহিলার হাতে তুলে দেন। মহিলা এতেই অনেক খুশি হয়ে যান। দুই মেয়ের প্রত্যেককে একটি করে খেজুর দিয়ে দেন। আর তৃতীয়টি নিজের জন্য নিজের কাছে রেখে দেন। অতঃপর খাওয়ার জন্য মুখের কাছেও তুলেন, কিন্তু খাওয়া হয় না আর। কেন? দেখেন, মেয়েদুটি খেজুরটির দিকে হাত বাড়িয়েছে। মা তখন খেতে নিয়েও আর খেতে পারেন না। তাকান মেয়েদ্বয়ের দিকে। তোলপাড় করে ওঠে মাতৃস্নেহ। সঙ্গে সঙ্গে খেজুরটি দুভাগ করে দুই মেয়ের হাতে তুলে দেন।

আয়শা (রা.) বলেন,

তার মমতায় আমাকে স্পর্শ করে। আমি তা আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনা করি। সব শুনে তিনি বললেন,

إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ...أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ.

আল্লাহ এই খেজুরের বিনিময়ে জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন তাঁর জন্য। অথবা জাহান্নাম থেকে

তাঁকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছেন।

জ্বলন্ত আঙ্গার ধারণকারী নারীরা ছুটে যায় আল্লাহর আনুগত্যের দিকে। সে আনুগত্য যত ছোট কাজেরই হোক না কেন? বড় কথা, অন্যায়-অপরাধ ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকা। অন্যায়-অপরাধ ও পাপাচারকে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَّ تَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ﴿۱۵﴾

তোমরা এটাকে তুচ্ছ মনে কর। অথচ আল্লাহর নিকট এটি অনেক বড়।

[সুরা আন নুর : ১৫]

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তিনি এক মহিলাকে জাহান্নামের আজাব ভোগ করতে দেখেন। প্রশ্ন করা হয়– কোন জিনিস তাকে জাহান্নামে নিয়ে গেছে? সে কি কোনো মূর্তির সামনে মাথা নত করেছে? কোনো নারী হত্যা করেছে? মানুষের সম্পদ আত্মসাত করেছে? না। এসব কিছুই করেনি। তাহলে কী কারণে সে জাহান্নামে গেল? শুধু একটি বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার কারণে। সে বিড়ালটিকে বন্দী করে রেখেছিল। কিন্তু খাবার দেয়নি। আবার ছেড়েও দেয়নি। এক সময় না খেয়েই মারা যায় বিড়ালটি।

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, আমি মহিলাকে জাহান্নামে এমতাবস্থায় দেখেছি যে, বিড়ালটি তাকে নোখ দ্বারা আঁচড়াচ্ছে।

ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো,

হে আল্লাহর রসুল! অমুক মহিলা রাত জেগে নফল ইবাদত করে, আর দিনের বেলায় রোজা রাখে। এবং প্রচুর দান-সদকা করে। তবে প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয় কটুকথা বলে বলে।

তখন আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওর মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। ওই নারী জাহান্নামি!

সাহাবায়েকেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসুল! অমুক মহিলা তো ফরজ সালাত আদায় করে এবং যৎসামান্য দান-সদকাও করে। কিন্তু কাউকে কষ্ট দেয় না।

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই সে জান্নাতবাসীনী!

যুদ্ধ!

হে নারী! এরা তোমাকে যে স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের দাবিতে প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে বলছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি তাদের, তুমি কি জান? উদ্দেশ্য হলো তোমাকে ইচ্ছা বা হুকুমের দাসে পরিণত করা। স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের নামে এদের আরও অনেক ধরনের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থের উদ্দেশ্য থাকে তোমাকে দিয়ে, যা তোমার অজানা। সেসবের কিছু এবার শোনো–

এরা কেন নিপীড়িত শ্রমিকের অধিকার আদায়ের পক্ষে, বিপদগ্রস্ত মানুষের পক্ষে এবং অসহায় এতিমের পাশে দাঁড়ায় না? কেন শুধু অভিভাবকের স্নেহের ছায়ায়...শাসনের ছায়ায় প্রতিপালিত সতী-সাধ্বী তরুণীদের প্রতি এদের এত মায়া আর মমতা? কেন এরা সব সময় [শুধু] নারীর জন্য চায় স্বাধীনতা?

যৌনকাতর অশুভ পাপ-দৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার জন্য হিজাব ও পর্দার জীবন দাসত্ব? যা থেকে মুক্ত হতেই হবে?

পরপুরুষের সংশ্রব ছাড়া পৃথক নারীকর্মস্থল প্রতিষ্ঠা কি নারীর জন্য লাঞ্ছনা ও অপমান?

গৃহে অবস্থান করে ছেলেমেয়েকে প্রতিপালন করা এবং স্নেহ-মায়া ও দূরদর্শী শাসন দিয়ে তাদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাকে কোন যুক্তিতে দাসত্ব বলবে? এ দাসত্ব থেকে নারীকে মুক্ত না করলে কী বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে?

মজার ব্যাপার, যারা আজ নারীকে দাসত্বমুক্ত করতে চিৎকার-চেঁচামেচি করছে এবং হিজাবকে নারীর জন্য শেকল ও জেল ভাবছে, এদের অধিকাংশই হয় ব্যভিচারী, নয় মদ্যপ কিংবা উন্মাতাল প্রবৃত্তির আত্মস্বীকৃত গোলাম।

তাহলে এরাই কেন নারীকে স্বাধীন করতে এতটা পাগল? কেন সংরক্ষিত হেরেমে সতীত্বের বেষ্টনীতে বসবাসকারী নারীদের বের করতে তারা এতটা মরিয়া?

স্পষ্ট উত্তর। এরা নারীকে চোখ ভরে দেখতে চায়। মেটাতে চায় চোখের ক্ষুধা। এরা নারীকে দেখতে চায়, স্বল্পবসনে নর্তকী হিসেবে। যখন নারীরা এদের ফাঁদে পড়ে হিজাব বর্জন করে এবং নাচের আসরে রূপ প্রদর্শন করে কিংবা এদের ইচ্ছে মতো চলে, তখনই এদের কণ্ঠ উচ্চকিত হয়, দেখো! আজ নারীকে মুক্ত করেছি আমরা।

নারীকে এরা ভোগ করতে চায় ইচ্ছেমতো। ফলে পুরুষের পাশে নারীর

অবস্থান এবং সংমিশ্রণকে শোভনীয় ও লোভনীয় করে তোলার জন্য এদের চেষ্টা-সাধনা ও গবেষণার কোনো অন্ত নেই। এরা নারীকে চলন্ত টয়লেট মনে করে। যখন ইচ্ছে তখনই ব্যবহার করা যায়।

কখনো শয্যায়। কখনো প্রমোদভ্রমণে। কখনো বারে। কখনো বিনোদন পল্লিতে। কখনো বাণিজ্যিক প্রচারণায়। কখনো বড় কর্তার অফিসে। কখনো নাচের আসরে। কখনো খেলার মাঠে। কখনো ওই নীলাভ আলোকজ্বলা বিশেষ পার্টিতে। আলোআঁধারি খেলায় নারীকে আরও মোহনীয় করে তুলতে। আরও বেশি আবেদনময়ী করে তুলতে।

হায়রে আমার অবলা নারী!

খেলার পুতুল হতে তোমার লজ্জা হয় না? নাচের পুতুল হতে কি তোমার বিবেক বাধে না? ইসলাম তোমার জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছে মাতৃত্বের আসন, সম্মানের সিংহাসন। সে আসনে বসে, সে সিংহাসনে আসীন হয়ে; রানি হতে কি তোমার সাধ জাগে না?

নারী! কেন তুমি দাসী হতে চাও? নারী! কেন তুমি রানি হতে চাও না? কেন তুমি এই দুষ্টলোকদের পাল্লায় পড়ে ওদের কথায় হাসছ, গাইছ, নাচছ, খেলছ, ব্যবহৃত হচ্ছ?

হাতে গোনা কিছু টাকার জন্য? ছি! টাকা তো যেনতেনভাবেও উপার্জন করা যায়। নইলে ওই যে বাইজি, তারও তো টাকা আছে? ওই টাকা কি সম্মানের? হালাল-হারামের পার্থক্য তুলে দিয়ে কোথায় চলছ তুমি? না বলে পারছি না– ধিক, শতধিক, তোমার এ স্বাধীনতাকে। তোমার এ স্বাধীনতা তো মূলত পরাধীনতা। জানি না, কবে হবে তোমার হুঁস!

মনে রাখবে, তোমার পণ্যমূল্য একদিন কমে

যাবে, ওই দুষ্টবণিকদের চোখে। তখন তোমাকে ওরা ছুঁড়ে ফেলে দেবে। নারীর যৌবনজীবনে জৌলুসের ধস নামলে ওরা নারীকে আর দেখতে পারে না। ওরা বড় নিষ্ঠুর। নারীর পাক দামানকে অপবিত্র ও ছিন্নভিন্ন করে বলে, এই দেখো! আমরা নারীকে এনে দিয়েছি স্বাধীনতা।

خَدَّعُوْهَا بِقَوْلِهِمْ حَسَنَاءِ وَالْغَوَانِيْ يُغَرِّهُنَّ الثَّنَاءُ

নারীকে এরা প্রতারিত করছে মিষ্টি কথার মোড়কে। হে সুন্দরী নারী! প্রতারিত করল তোমায় মিথ্যা শ্লাঘা?

এরা চায় সমুদ্রতীরে নারীকে স্বল্পবসনে কিংবা উলঙ্গ দেখতে। মদের আসরে নারীর হাতে মদ খেতে। বিমান-সফরে নারীকে একান্ত কাছে পেতে। কখনো সেবিকার বেশে, কখনো পাপাচারিনী সঙ্গিনী হিসেবে। ফলে সবকিছুকেই তারা নারীর সামনে শোভনীয় ও লোভনীয় করে তোলে। অবশেষে নারী যখন তাদের দেখানো পথে হাঁটতে হাঁটতে পাপাচারের জলাভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয় এবং পাপাচারের জল পান করতে করতে নিঃশেষ করে একসময় অবশিষ্টাংশ চাটতে থাকে, তখন এরা পরস্পর হাসাহাসি করে বলে,

আমরাই এনেছি হে নারী! তোমার এই স্বাধীনতা। তুমি না ছিলে বন্দিনী! এখন হয়েছ নন্দিনী! হে নন্দিনী! ভোগ করো। জীবনটাকে উপভোগ করো। ওই মোল্লাদরে কথায় কান দিও না। ওরা কুরআন-হাদিসের দোহাই দিয়ে তোমাকে শুধু চায় বঞ্চিত করতে।

আশ্চর্য! আসলেই কি নারী ছিল জেলাবদ্ধ? বেরিয়ে এসেছে এখন মুক্ত স্বাধীনতায়? স্বাধীনতা কি মামা বাড়ির আম কুড়ানো মোয়া? কিংবা মাসির ঘরের সুখ? কে বলেছে স্বাধীনতা স্বল্পবসনে? কে বলেছে স্বাধীনতা খাটো জামায়? কে

বলেছে স্বাধীনতা পর্দাহীনতায়? কে বলেছে স্বাধীনতা বিপনীবিতানে ভিড় করায়? কে বলেছে স্বাধীনতা পরপুরুষ-সঙ্গীর সঙ্গে নীল হয়ে যাওয়ায়?

স্বাধীনতা! পাপাচারী যুবকের সঙ্গে কথা বলা? পাপের বাজারে চুপি চুপি হাঁটা? এমন যদি হও তুমি, হে স্বাধীনতা! তাহলে ধিক, শতধিক তোমাকে। চাই না আমি, আমার মাতৃজাতির জন্য এমন পাপময় স্বাধীনতা!

তাহলে প্রকৃত স্বাধীনতা কী? প্রকৃত স্বাধীনতা এই ভণ্ডদের ডাকে সাড়া না দেওয়া। ঘৃণাভরে এদের প্রতারণাময় আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করা। সতীত্ব রক্ষার জন্য হিজাব ও পর্দার জীবনকে আঁকড়ে ধরা।

মনে রাখবে হে নারী! এরা নয়। তোমার প্রকৃত বন্ধু তোমার পিতা। তোমার ভাই। তোমার স্বামী। তোমার সন্তান। পিতা তোমাকে দেবেন স্নেহের ছায়া। স্বামী তোমাকে দেবেন মমতা ও ভালোবাসা। ভাই তোমাকে দেবেন প্রহরা। সন্তান তোমাকে দেবে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

আচ্ছা বলো তো, এই যে এত সব সম্মান, তা কোথায় পাবে তুমি? মহান বিধাতার বিধান ছাড়া? এখানেই আছে তোমার প্রকৃত স্বাধীনতা এবং এ স্বাধীনতাই হোক তোমার জীবনের একমাত্র পাথেয়।

নারী তুমি একজন দূত!

দুই ভাগে বিভক্ত সমাজ। ভেতরের এবং বাইরের। বাইরের অধিপতি সমাজের পুরুষ। দায়িত্ব তার কর্মের ময়দানে ঘাম ঝরানো শ্রম দিয়ে

আয়-উপার্জন করা। খাদ্যের সংস্থান করা। গৃহ নির্মাণ করা। অসুস্থতার সময় সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

নারী, গৃহসাম্রাজ্যে অবস্থান করে গৃহ সাজাবে। সন্তানের শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব নেবে। ঘরের যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেবে। নারীর কাজ নারী করবে। পুরুষের কাজ পুরুষ করবে। একজনের কাজে আরেকজন ঢুকতে চাইলেই দেখা দিবে বিপত্তি?

বায়হাকির গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, আসমা বিনতে ইয়াজিদ একবার আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন। নবীজি তখন সাহাবায়েকেরামের মাঝে বসা ছিলেন। তিনি বলেন,

আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আমি আপনার কাছে এসেছি মহিলাদের প্রতিনিধি ও দূত হয়ে। আপনার খিদমতে আমি আরজ করতে চাই– যত নারী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে আছে, তাঁরা আমার ভাষ্য শুনুক বা না শুনুক, আমি মনে করি তারা সবাই আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে নারী-পুরুষ সবার কাছেই পাঠিয়েছেন, সত্যধর্ম ইসলাম দিয়ে। আমরা সবাই আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি। মহান প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন। মূলত আমাদের নারী সমাজ অবরুদ্ধ, যেহেতু তাঁরা অন্তঃপুরবাসিনী। তাই তাঁরা গৃহে বসে বসে আপনাদের গৃহের ভিত্তি নির্মাণ করে। আপনাদের চাহিদা পূরণ করে। তাঁরা আপনাদের সন্তানের গর্ভধারিণী। আর আপনারা যারা পুরুষসম্প্রদায়, তাঁরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছেন। আপনারা জুমায় অংশ নিতে পারেন। জামাতে শরিক হতে পারেন। জিহাদে যেতে পারেন। আপনাদের কেউ যখন হজে বা

জিহাদে যায়, তখন আমরা আপনাদের সম্পদের হিফাজত করি। আপনাদের কাপড় বুনন করি। আপনাদের সন্তানদের লালনপালন করি। হে আল্লাহর রসুল! আমরা কি বিনিময় লাভে আপনাদের সঙ্গে সমঅংশীদার হতে পারব?

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবিদের দিকে তাকান। তারপর বলেন, তোমরা কি কখনো-এর আগে অন্য কোনো মহিলার মুখে এমন প্রশ্ন শুনেছ! দীনের বিষয়ে এর চেয়ে আরও অধিক সুন্দর কোনো জিজ্ঞাসা?

সাহাবিরা বললেন, না। তখন আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, হে নারী! ফিরে যাও। আর জানিয়ে দাও, অন্য সকল নারীকে, যদি তোমাদের কেউ স্বামীর হক আদায় করে, স্বামীর সন্তুষ্টি তালাশ করে এবং তার মতামত মেনে চলে, তাহলে আল্লাহ পুরুষের সমস্ত আমলের নেকির বরাবর তাঁকেও দান করবেন।

এ কথা শুনে আসমা বিনতে ইয়াজিদ আনন্দে আপ্লুত হয়ে... লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, বলতে বলতে ফিরে গেলেন।

হ্যাঁ, প্রত্যেকেরই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন জগৎ। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র। নারীর সাম্রাজ্য তাঁর গৃহ। সেই এই গৃহের অধিপতি বা সম্রাজ্ঞী। আর তাঁর স্বামী অধিকর্তা বা সম্রাট। আর সন্তানরা প্রজা।

উম্মে উমারাহ (রা.)-র বীরত্ব

তাবাকাত ইবনে সাদ-এর সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উম্মে উমারাহ (রা.) একজন নারী হওয়া সত্ত্বেও ওহুদ যুদ্ধে অংশ নেওয়ার অনুমতি লাভ করেন। তাঁর কাজ ছিল মুজাহিদদের পানি পান করানো এবং আহতদের চিকিৎসা দেওয়া। কিন্তু যুদ্ধের একপর্যায় যখন মুসলিম শিবিরে বিপর্যয় নেমে আসে এবং সৈন্যদের দিকবিদিক ছুটা শুরু হয়, তখন উম্মে উমারাহ (রা.) দেখলেন, মুসলিম সৈন্যরা বিশৃঙ্খল হয়ে

গেছে। আর কাফেররা বীরত্ব প্রদর্শন করছে। হামলার পর হামলা করছে। প্রতিরোধ করে যাচ্ছেন শুধু মহান আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পাশের দশজন সাহাবি। তখন আর উম্মে উমারাহ (রা.) স্থির থাকতে পারলেন না। পানি পান করানোর কাজ ফেলে; ছুটে যান ঝলসানো তলোয়ার হাতে। অন্যান্য সাহাবিদের মতো তিনিও আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে দুশমনের হামলা প্রতিহত করতে থাকেন। শুধু তাই নয়- তাঁর ঝলসে ওঠা তলোয়ারে এক মুশরিকও হয় নিহত।

নারীরা গৃহেই থাকবে। তারা গৃহসম্রাজ্ঞী। কিন্তু মাঝে মধ্যে এ নিয়মের লঙ্ঘনও হয়। আর সেটাও আল্লাহ ও আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই হতে হবে। ইসলাম বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে নয়। স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয়। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও কখনো কখনো জুতা সেলাই করেছেন। কাপড় পরিষ্কার করেছেন। পরিবারের সহযোগিতা করেছেন।

তুমি আমাদের কাছে কত মূল্যবান, জান কি তুমি?

হ্যাঁ, তুমি আমাদের কাছে সীমাহীন মূল্যবান। আল্লাহ স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছেন তোমার পিতা-মাতাকে তাঁর রসুলের মাধ্যমে। সহিহ মুসলিমের হাদিস। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ.

যে ব্যক্তি দুটি মেয়ে সন্তানের লালন-পালন করবে, পরিণত বয়সে পৌঁছা পর্যন্ত। জান্নাতে তার ও আমার মাঝে দূরত্ব থাকবে, আমার এই দুই আঙুল সমপরিমাণ ।

[সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৮৬৪]

আর তোমার সন্তানদের নির্দেশ দিয়েছেন তোমার সঙ্গে সদাচরণ করতে।

বুখারি ও মুসলিমের হাদিস, এক ব্যক্তি আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়য়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে, আমার উত্তম সদাচরণের সবচেয়ে বেশি হকদার কে?

নবীজি বলেন, তোমার মা। অতঃপর তোমার মা। অতঃপর তোমার মা.। তারপর তোমার বাবা।

বরং আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামীকেও নির্দেশ দিয়েছেন স্ত্রীর প্রতি সদাচরণ করতে। যে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে রাগারাগি করে অথবা তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, তাকে হাদিসের ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে।

বিদায় হজের সময় আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ভাষণ দিতে দাঁড়ান। সামনে লক্ষাধিক সাহাবি। তাঁদের ভেতর রয়েছে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ। ছোট ও বড়। ধনী ও গরিব। সবাইকে লক্ষ্য করে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সাবধান! তোমরা নারীদের মঙ্গল কামনা করবে। সাবধান! তোমরা নারীদের মঙ্গল কামনা করবে।

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, একদিন অনেক মহিলা এসে উম্মুল মুমিনীনদের নিকট নিজেদের স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। তা আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারেন। তখন তিনি সাহাবিদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, মুহাম্মদের পরিবারের নিকট অনেক মহিলা এসে স্বামীদের বিরুদ্ধে

অভিযোগ করছে। [যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে] এরা তোমাদের মধ্যে ভালো লোক নয়।

ইবনে মাজা ও তিরমিজিতে ইরশাদ হয়েছে,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ.

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে তার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম। আমি আমার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম।

মেশক ও আম্বর!

কখনো কখনো স্বামী ক্ষুদ্র বিষয়েও স্ত্রীকে সাবধান করেন। কেন করেন? দীনের স্বার্থে। স্ত্রীর পরকালে মুক্তির স্বার্থে।

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর ঘটনা স্মরণ করো, তিনি কী করেছেন? মিসর থেকে একবার তাঁর নিকট কিছু মেশক ও আম্বর আসে। তিনি তা বিক্রয় করে তার মূল্য বাইতুলমাল [রাষ্ট্রীয় কোষাগার]-এ জমা রাখবেন। কিন্তু সেই মেশক ও আম্বর বিক্রয়ের দায়িত্ব দেবেন কাকে? কে পারবে মেশক ও আম্বরের মতো মূল্যবান জিনিস ভালো করে ওজন করতে? হজরত ওমর (রা.) ঘোষণা করেন, আমি চাই মাপায় অভিজ্ঞ কোনো মহিলা এটিকে ভাঙুক এবং বিক্রি করে বাইতুল মালে তার টাকা জমা করুক।

এ কথা শুনে তাঁর স্ত্রী বললেন, আমিই প্রস্তুত এ কাজের জন্য, হে আমিরুল মুমিনীন!

ওমর (রা.) বলেন, তাহলে তুমিই করো।

এরপর মহিলারা তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে মেশক ও আম্বর ক্রয় করে নিতে থাকে। তিনি নিজ হাতে আম্বর ভেঙে ভেঙে তা বিক্রি করেন। তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই

তাঁর হাতের আঙুলে সামান্য সুগন্ধি লেগে যায়। আর তিনি তা নিজের ওড়নায় মুছে নেন।

রাতে ওমর (রা.) গৃহে ফিরে আসেন, এসে বিক্রিত মেশক ও আম্বরের টাকা স্ত্রীর কাছ থেকে বুঝে নিতেন। তবে স্ত্রী তাঁর কাছে আসতেই তিনি স্ত্রীর দেহ থেকে ঘ্রাণ পান। জিজ্ঞেস করেন, তুমিও কি সুগন্ধি খরিদ করেছ?

স্ত্রী বলে, না তো!

তিনি বললেন, তাহলে তোমার কাছ থেকে ঘ্রাণ পাচ্ছি যে?

স্ত্রী তখন বলে, আমার আঙুলে যা লেগেছে, তা ওড়নায় মুছে নিয়েছি তাই।

তখন ওমর (রা.) বললেন, কী বলছ! মহিলারা নিজেদের পয়সায় ক্রয় করে সুবাসিত হচ্ছে, আর তুমি সুবাসিত হচ্ছ বিনে পয়সায়!

এরপর তিনি স্ত্রীর মাথা থেকে ওড়না টেনে নিয়ে ছাদে থাকা একটি পানিভরা মশকের নিকট চলে যান। এবং সেটাকে খুব ভালো করে ধোন। বারবার শুঁকেন, না; ঘ্রাণ এখনো যায়নি। এরপর তিনি মাটিতে আবার ঘষেণ। এবং পানি ঢেলে বারবার ঘষতে থাকেন মাটির সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত সুগন্ধি দূর হয়। শেষে খুব ভালো করে পানি ঢেলে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে ওড়নাটি স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেন।

এসব তিনি কেন করলেন? যাতে কঠিন হিসাব থেকে স্ত্রী বেঁচে যায়। জাহান্নামের বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে স্ত্রী রেহাই পায়। আল্লাহর ঘোষণার ওপর তিনি আমল না করলে কে করবে আমল!

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

হে মুমিনগণ! নিজেদের এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে বাঁচাও জাহান্নামের আগুন থেকে। যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত রয়েছে নির্দয়হৃদয়েরর ও কঠোরস্বভাবের ফেরেশতাগণ। যারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অমান্য করে না, যেসব আদেশ তাঁদের করা হয় সে ক্ষেত্রে। এবং তাঁদের যা করতে আদেশ দেওয়া হয়, তাই তারা করে। [সুরা তাহরিম : ৬]

হে নারী! তেমার জন্য পারি আমি আমার মস্তক গুঁড়িয়ে দিতে!

দীন নারীকে এত বেশি সম্মান দিয়েছে যে, মাত্র একজন নারীর জন্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। মস্তক গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এসো চোখ বুলিয়ে দেখি, সেই ইতিহাসের পাতায়–

ইহুদিরা মদিনায় মুসলমানদের পাশেই বসবাস করত। মুসলমানদের মদিনায় আগমনকে ইহুদিরা মোটেই ভালোচোখে দেখেনি। ওরা ভেতরে ভেতরে জ্বলত শুধু।

বিশেষভাবে মহিলাদের হিজাব পড়ার নির্দেশের ওহি যখন অবতীর্ণ হয়, তখন ওরা তেলেবেগুণে জ্বলে ওঠে। গোপনে হিজাব-পরা কোনো মহিলাকে দেখলেই ওদের গা শিরশির করে ওঠে। হিজাবের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র করেও ওরা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। অনেক নারীকেই বিপথগামী করার চেষ্টা করেছিল ওরা। কিন্তু যে নারীর হৃদয়ে ইমানের নুর প্রবেশ করেছে– কেন তারা বজ্জাত

ইহুদিদের ফাঁদে পা দেবেন? এ ক্ষেত্রে ইহুদিরা চরমভাবে ব্যর্থ হয়।

একদিন এক মুসলিম নারী, নিজের প্রয়োজনে বনু কায়নুকার ইহুদি স্বর্ণালংকারের বাজারে গমন করেন। ছিলেন তিনি হিজাব পরিহিতাবস্থায়। এক স্বর্ণকারের দোকানে এসে বসেন। ইহুদিরা তাঁকে হিজাব পরে দোকানে বসতে দেখে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাতে থাকে। ইহুদিরা তাঁর চেহারা দেখে মজা লুটার জন্য তাঁকে স্পর্শ করার উদ্দেশে, কিংবা তাঁকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্য বিভিন্ন ফন্দি-ফিকির আঁটতে থাকে। মহীয়সী নারীদের সঙ্গে সাধারণত এমনই আচরণ করত ওই ইহুদিরা।

একপর্যায় ইহুদিরা তাঁকে চেহারা উন্মোচনের জন্য বলে। অবগুণ্ঠন খোলার জন্য বলে। কিন্তু মুসলিম নারী তাদের মনোবাসনা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। এদিকে ইহুদি স্বর্ণকার এক অসতর্ক মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে মহিলার পরনের কাপড়ের নীচের অংশটি তাঁর পীঠের ওড়নার সঙ্গে বেঁধে দেয়। একটু পর মহিলা যখন দাঁড়াতে যায়, তখন পেছন দিক থেকে তাঁর সতর অনাবৃত হয়ে যায়। উপস্থিত ইহুদিরা এক যুগে উল্লাসে মেতে ওঠে। মজা লুটতে থাকে। এ আকস্মিক দুর্ঘটনায় মহিলা চিৎকার করে বলে,

হায়! ওরা যদি আমার সতর অনাবৃত না করে আমাকে মেরে ফেলত! তাও তো ভালো হতো!

এ ঘটনা প্রত্যক্ষের পর এক মুসলিম যুবক তাঁর তলোয়ার খাপমুক্ত করে। ঝাঁপিয়ে পড়ে খবিস স্বর্ণকারের ওপর। এবং নিমিষেই পাঠিয়ে দেয় জাহান্নামে। তখন সমবেত ইহুদিরাও তাঁর ওপর
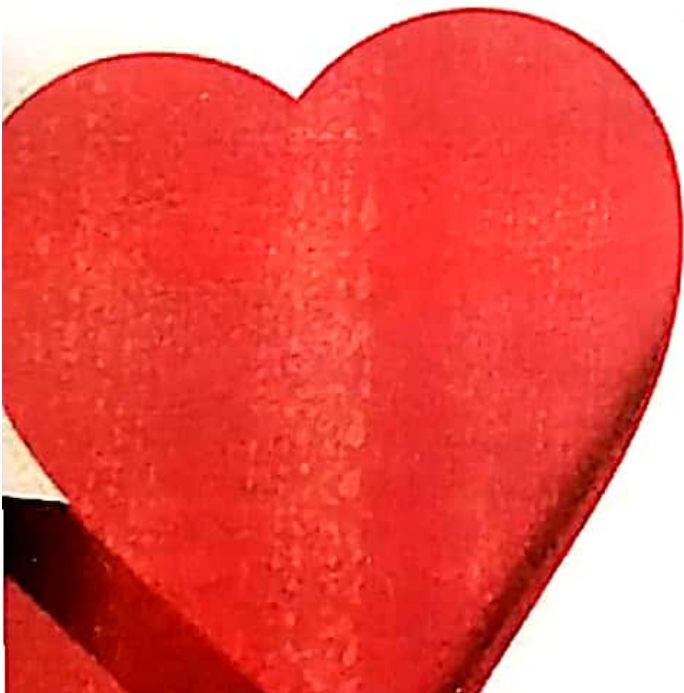
ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁকেও হত্যা করে।

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারেন, ইহুদিদের চুক্তি ভাঙার কথা। নারী লাঞ্ছনার কথা। এতে ভীষণ ক্ষুব্ধ হন তিনি। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বনু কায়নুকার ইহুদিদের অবরোধ করার নির্দেশ দেন। শুরু হয় অবরোধ। কয়েকদিনেই ইহুদিরা আত্মসমর্পণ করে।

এরপর আসে সেই মুসলিম নারীকে অসম্মানিত করার সাজা দেওয়ার পালা। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। এরই মধ্যে বাধসাধে মুসলিম নামধারী এক শয়তান। যার নিকট মুসলিম নারীর সম্ভ্রমের ছিল না ন্যূনতম কোনো মূল্য। বরং নারীকে সে মনে করে শুধু ভোগ্যপণ্য। এই শয়তানের নাম আবদুল্লাহ বিন উবাই। মুনাফিকদের সরদার। সে বলে, মুহাম্মাদ! আমার ইহুদি বন্ধুদের প্রতি তুমি সদাচরণ করো।

জাহেলি যুগে ইহুদিরা মিত্র ছিল তার। কিন্তু আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথায় কর্ণপাত করেন না। যারা মুমিনদের ভেতর অশ্লীলতা ছড়াতে চায়, তাদের ক্ষমা করা যায় না। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কঠোর মনোভাব দেখে মুনাফিক নেতা আবার সুপারিশ করে। হে মুহাম্মাদ! তুমি আমার বন্ধুদের প্রতি সদাচরণ করো।

আগের মতোই নবীজি তার সুপারিশকে আমলে নেন না; বরং নারীর সম্ভ্রম ও ব্যক্তিত্বকে রক্ষার স্বার্থে তিনি নিজের সিদ্ধান্তে থাকেন অটল। এতে চটে যায় শয়তানটা। সে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলে,

আমার মিত্রদের প্রতি অবশ্যই সদয় হতে হবে তোমাকে! আমার মিত্রদের প্রতি অবশ্যই সদয় হতে হবে তোমাকে!

আল্লাহর রসুল তার আচরণে বেশ অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, আমাকে ছাড়!

কিন্তু মুনাফিক তাঁকে ছাড়েন না; নবীজিকে বারবার অনুরোধ করতে থাকেন। ইহুদিদের হত্যা না করার আবেদন করতে থাকেন। অগত্যা নবীজি তার দিকে তাকিয়ে রাগ হয়ে বলেন,

ঠিক আছে যা, তোমার কথাই রাখা হবে!

তবে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদিদের প্রাণে না মারলেও নির্বাসিত করেছেন।

খাটিয়ার ওপরেও!

নবী নন্দিনী ফাতেমা (রা.) সব সময় হিজাব পরে বাইরে বের হতেন। আর তাঁর হিজাবের ধরন ছিল এমন, যাতে কোনোভাবেই পরপুরুষ হিজাবের ভেতর কে আছে তা বুঝতে না পারে। এমনকি কীভাবে মৃত্যুর পর তাঁর পর্দা রক্ষা হবে, তা নিয়েও তাঁর ছিল ভীষণ চিন্তা। যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তখন তিনি বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। এই ভেবে যে, মৃত্যুর পর তো পরপুরুষরা তাঁকে দেখবে কাপড় দিয়ে মোড়ানো অবস্থায়, তখন তাঁর আকার-আকৃতি তো তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে যাবে! এসব ভাবতে ভাবতেই তিনি পাশে বসা হজরত আসমা বিনতে আবু বকরকে বললেন, আসমা! মৃত্যুর পর মহিলাদের যেভাবে দাফন-কাফন করা হয়, আমার কাছে তা ভীষণ অপছন্দ।

আসমা বলেন, হে নবী নন্দিনী! আমি আপনাকে একটি অবকাঠামো দেখাতে পারি, যা আমি হাবশায় দেখে এসেছি।

ফাতেমা বলেন, কী দেখে এসেছ তুমি? বলো দেখি আমাকে!

তখন হজরত আসমা একটি খেজুর গাছের তাজা ডাল আনেন এবং তা বাঁকা করেন। দেখতে একেবারে গম্বুজের মতো হয়ে ওঠে। তারপর তিনি তার ওপর একটি কাপড় দিয়ে দেন। তখন হজরত ফাতেমা (রা.) খুশি হয়ে বলেন, দারুণ। খুব সুন্দর। এতে পুরুষ থেকে নারীকে পৃথকভাবে চেনা যাবে না। মাশাআল্লাহ!

তাঁর প্রয়াণের পর তাঁকে কাফনে মোড়ানো হয়। এবং তাঁর কফিনের আকৃতি করা হয়েছিল হজরত আসমার দেখানো পদ্ধতিতেই।

মৃত্যুর বিছানায় শুয়েও হজরত ফাতেমা (রা.)-র হিজাব ও পর্দার চিন্তা ছিল এমন। বলো, তাহলে জীবদ্দশায় হিজাব ও পর্দার প্রতি তিনি কতটা ছিলেন সতর্ক!

সুবহানাল্লা! কোথায় সেই মুসলিম নারীরা, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার দাবি করে! হৃদয়-মন যাদের জান্নাত-স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে! কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, তবুও তারা কেন যায়, মহিলা সেলুনে? কেন সেখানে গিয়ে তারা আরেক মহিলার সামনে সতর খুলে দেয়? সতরের অংশ থেকে চুল ফেলে দেওয়ার জন্য? অথচ তিরমিজি শরিফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ إِمْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا ....فِيْ غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا...إِلَّا هَتَكَتِ السَّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا.

যে নারী স্বামীর ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও সতর খুলে, সে যেন আল্লাহ এবং তার মধ্যকার পর্দা ছিন্ন করে ফেলে।

[সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ২৯৫৫]

বায়হাকিতে বর্ণিত আছে,

شَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلَاتُ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ
لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلَّامِثْلَ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ.

তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট নারী তারা, যারা পর্দাহীন ও অহংকারী। এরাই মুনাফিক। এরা

জান্নাতে প্রবেশ করবে না। [সুনানে বায়হাকি, হাদিস নং ১৩৮৬০]

ওই নারীরা কোথায়! যাদের ব্যাপারে আমরা আশায় বুক বেঁধেছিলাম যে, এরা ইসলামকে সহযোগিতা করবে? ইসলামের জন্য নিজেদের জান-মাল খরচ করবে? দেখা যায়, তারা কেউ গায়ে জড়িয়েছে নকশা করা বোরকা এবং পরেছে হাই হিল, তারপর গিয়েছে মার্কেটে কিংবা বিনোদন পার্কে! কিংবা পরেছে প্যান্ট বা ট্রাউজার! আর বলছে, আমার ভাইয়েরা ছাড়া এ অবস্থায় আমাকে আর কেউ দেখে না! অথবা আমি শুধু মহিলাদের মধ্যেই এসব পরে থাকি!

কথা হচ্ছে এসবের কিছুই তো জায়েজ নেই।

কখনো কখনো দেখা যায় নিজে তো অপরাধে লিপ্ত হয়েছেই, তারপর আরেকজনকেও সে অপরাধে লিপ্ত হতে করছে প্ররোচিত! নিজেদের মধ্যে করছে অশ্লীল ছবি বিনিময়। সন্দেহজনক ফোন নম্বর করছে বিনিময়। নষ্টামি আর নচ্ছারিতে ভরা পত্র-পত্রিকা করছে বিনিময়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۹﴾

যারা মুমিনদের ভেতর অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা জানেন। আর তোমরা জান না। [সুরা আন নুর : ১৯]

হায়রে অসহায় নারী!

নারী যদি খোলামেলা ও পর্দাহীন অবস্থায় চলাফেরা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, তবে এটি তাঁর জন্য এক অশনি সংকেত। কেননা, এটি তাঁকে ধীরে ধীরে নষ্ট জীবনের দিকে নিয়ে যাবে। মানুষের চোখেও সে মূল্যহীন ও তুচ্ছপণ্যে পরিণত হবে।

আমি একবার কয়েকজন ছাত্রের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তোমরা যারা বিপণিবিতানগুলোতে কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল ফটকে [ছুটির সময়] তরুণীদের পেছনে পেছনে ঘুরঘুর করো, সেসব তরুণীকে তোমরা কোন দৃষ্টিতে দেখ?

তারা সবাই আমাকে বলে, আমরা মোটেই তাঁদের ভালো চোখে দেখি না। আমরা তাঁদের নষ্ট মনে করি। আমরা তাঁদের সঙ্গে কিছু দিনের জন্য একটু প্রেমপ্রেম খেলা করি। তারপর আমাদের ইচ্ছে পূরণ হয়ে গেলে কিংবা প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে ওদের আমরা ছুড়ে ফেলে দিই।

তাদের একজন তো এও বলে, শায়খ! বিশ্বাস করুন, যখন আমরা বিপণিবিতানগুলোতে ঘুরে বেড়াই, আর কোনো লজ্জাবতী সুশীলা পর্দানশীল নারীকে দেখতে পাই, তখন তাঁকে নিজের অজান্তেই শ্রদ্ধা জানাই। তার নিকটবর্তী হওয়ার সাহসই পাই না। বরং কেউ এমন সাহস করলে আমরাই তাকে বাধা দিই।

একটু লক্ষ্য করো, সেইসব দেশের প্রতি যেখানে স্বাধীনতা রয়েছে বলে মানুষ ধারণা করে। সেখানে নারীরা এতটাই খোলামেলা ও আবরণহীন, এতটাই চারিত্রিক ও নৈতিকতার অবক্ষয়ের শিকার যে, তা শুনে রীতিমতো আঁতকে উঠতে হয় এবং অনুশোচনার আগুনে জ্বলতে হয়। সংক্ষিপ্ত একটা পরিসংখ্যান এখানে তুলে ধরছি–

আমেরিকাতে প্রতিদিন এক লক্ষ নয় শ তরুণী ধর্ষণের শিকার হয়। এর মধ্যে বিশজন নিজের জন্মদাতার দ্বারা ধর্ষিতা হয়।

বছরে দশ লক্ষ শিশুকে হত্যা করা হয় গর্ভপাতের মাধ্যমে কিংবা জন্মের পর পর। আর আমেরিকাতে এক শ-র ভেতর ষাটটি তালাকই দেওয়া হয় স্ত্রীর পক্ষ থেকে।

বৃটেনে প্রতি সপ্তাহে এক শ সত্তরজন যুবতী জারজ সন্তান প্রসব করে। তবে সেখানে অনেক যুবতীকে এমনও পাবে, যারা তোমার মতো পর্দা ও হিজাবের জীবনের আকাঙ্খায় দিনাতিপাত করছে।

যত খোলামেলা হবে নারীরা, তত গরম হবে অশ্লীলতার বাজার। তথা চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই ও বিভিন্ন রকমের অপরাধ। শয়তান পৃথিবীতে অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টির জন্য এই নারীকেই করে ব্যবহার। সুতরাং যে নারী শয়তানের ফাঁদে পা দেবে, শয়তানের আনুগত্য করবে, প্রবৃত্তির দাসত্বকে মেনে নেবে, আধুনিকতা ও ফ্যাশনের আনুগত্য করবে, পোশাকে কিংবা বোরকায়, ভ্রূ কর্তনে বা সরু করায়, গান-বাজনায় বা ছায়াছবি ও নাটক দেখায় অথবা পত্র-পত্রিকায়, আর এসব যখন তার নিকট তার রব-এর শরিয়ত পালনের চেয়েও বেশি মূল্যবান হয়ে উঠবে, তখন সেই নারী হয়ে

যাবে নাফরমান। তার জন্য-ই সৃষ্টি করা হয়েছে জাহান্নামের আগুন।

সহিহ মুসলিমের হাদিসে হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমরা একদিন আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে বসা ছিলাম। তখন আমরা একটি বিকট শব্দ শুনতে পাই। আল্লাহর নবী আমাদের জিজ্ঞেস করেন, জানো এ শব্দ কিসের?

আমরা বলি, আল্লাহ ও তাঁর রসুলই ভালো জানেন।

তিনি বলেন, এটা একটি পাথর। জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে সত্তর হাজার বৎসর ধরে, এখন তা গিয়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে জাহান্নামের একেবারে তলদেশে।

এ হলো সেই নারীর অবস্থা, যে নারী তার রব-এর নাফরমানি করবে এবং নিজের আখেরাতকে ভুলে যাবে। আমলের পাল্লা হবে হালকা। পিতামাতা তার দায়-দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করবে। এবং নিজেদের তার অপকর্ম থেকে মুক্ত ঘোষণা করবে। তাদের বন্ধুবান্ধবরা সেই দিন কোনো উপকারে আসবে না। কোনো কাজে লাগবে না তাদের বালা ও চুড়ির ঝমকালো রূপের ঝলক।

কীভাবে জাহান্নামিরা জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে অনন্তকাল? আসবে না ঘুম। হবে না মরণ। হাঁটতে হলে হাঁটতে হবে আগুনেই। বসতে হলে বসতে হবে আগুনেই। পান করতে হলে পান করতে হবে দূষিত পানি। খেতে হলে খেতে হবে জাক্কুম। বিছানা? সেও তো আগুন! লেপ-তোশক? সেও তো আগুন! পরনের কাপড়চোপড়? সেও তো আগুন। শুধু আগুন আর আগুন! আগুন ছেয়ে থাকবে তাদের চেহারায়।

জাহান্নামিরা থাকবে শেকলপরা। শেকলের মাথা থাকবে ফেরেশতাদের হাতে। যখন তখন তারা এদের জাহান্নামের আগুনে টেনেহেঁচড়ে ঘুরে বেড়াবে। তখন কী ভয়ানক কষ্ট যে হবে! তাদের শরীর থেকে দূষিত পূঁজ বের হবে। শোনা যাবে আর্তচিৎকার। খোস-পাঁচড়ায় তাদের দেহ থেকে চামড়া খসে খসে পড়বে। থাকবে শুধু হাড্ডি। তাদের দেহ থেকে ছড়াবে তীব্র গন্ধ। কেমন সে গন্ধ? যদি কোনো জাহান্নামিকে দুনিয়ায় আসার সুযোগ দেওয়া হতো, তাহলে তার শরীর থেকে ছড়ানো গন্ধে দুনিয়ার সব মানুষ মারা যেত। এবং তাদের আকৃতি হয়ে যেত বিকৃতি। দোযখে অপরাধীদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের আজাবের ব্যবস্থা থাকবে, যাতে তারা অধিক পরিমাণে দগ্ধ হয়। বিষয়টি আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে বয়ান করেছেন।

হাতুড়ির প্রহার

আল্লাহ তাআলা বলেন, অতএব যারা কাফের, তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে। তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে তা এবং চামড়া গলে বের হয়ে যাবে। তাদের জন্য আছে লোহর হাতুড়ি। [সুরা হজ : ১৯,২০]

কাফেরদের লোহার গরম ছড়ি ও হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হবে। এতে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। এরপর আবার তাদের দেহ স্বাভাবিক হয়ে যাবে এবং আবার পেটানো হবে।

শোনো, বনি ইসরাইলের এক বৃদ্ধার গল্প

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এক বেদুইন আসে। নবীজি তাঁকে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বলেন, আসেন, আসেন।

নিকটে এলে নবীজি জিজ্ঞেস করেন, কী প্রয়োজনে আসলেন?

লোকটি বলে, কোথাও যাওয়ার জন্য আমি আপনার নিকট একটি উট চাই। আর আমার পরিবারের দুধ পানের জন্য কয়েকটি বকরি চাই।

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, তোমরা কি বনি ইসরাইলের সেই বৃদ্ধার মতো হতেও অক্ষম?

অতঃপর সাহাবায়েকেরাম বলেন,

হে আল্লাহর রসুল! বনি ইসরাইলের বৃদ্ধা, সে আবার কী?

নবীজি তখন কাহিনি খুলে বলেন। মুসা (আ.) যখন মিসর থেকে রওনা হলেন, তখন পথ হারিয়ে ফেলেন। বলে ওঠেন,

এ কী? পথ হারিয়ে ফেললাম যে!

তখন বনি ইসরাইলের পণ্ডিতগণ বলেন, ইউসুফ আলাইহিস সালাম মৃত্যুর সময় আমাদের কাছ থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, মিসর থেকে চলে গেলে যেন আমরা নিজেদের সঙ্গে তাঁর দেহাবশেষ নিয়ে যাই।

তখন মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, কোথায় আমরা তাঁর কবর খুঁজে পাবো?

তারা বলে, সেটি বলে দিতে পারবে শুধু বনি ইসরাইলের ওই বৃদ্ধা। তখন বৃদ্ধার কাছে লোক পাঠানো হয়। বৃদ্ধা উপস্থিত হলে মুসা (আ.) বললেন, ইউসুফ (আ.)-র কবর কোথায় সেই সংবাদ আমাদের বলে দাও।

তখন বৃদ্ধা বলে, হ্যাঁ বলে দিতে পারি, তবে শর্ত আছে। আমাকে একটি প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

প্রতিশ্রুতি? কিসের প্রতিশ্রুতি?

আমি যাতে জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকতে পারি। এই প্রতিশ্রুতি।

মুসা (আ.) তাঁকে এমন প্রতিশ্রুতি দিতে চাইলেন না। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে ওহি পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন, দাও প্রতিশ্রুতি।

অতঃপর মুসা (আ.) তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন মহিলা আনন্দচিত্তে তাদের নিয়ে একটি জলাশয়ের কাছে যায়। বলে, এখান থেকে পানি সরাও।

সরানো হয় পানি। এরপর বৃদ্ধা বলে, এবার খনন করো।

কথামতো খননকাজ চালানো হয়। একপর্যায় বেরিয়ে আসে ইউসুফ (আ.)-এর হাড্ডি। হাড্ডি বেরকরে আনতেই রাস্তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায়।

দেখলে তুমি? কী বিশাল পার্থক্য দুটি চাওয়ার মাঝে? দুধ পানের জন্য বকরি, সওয়ার হয়ে কোথাও যাওয়ার জন্য উট চাওয়া, আর জান্নাতে নবীর সঙ্গে থাকতে চাওয়ার মাঝে এই যে পার্থক্য! তা কি আসলেই বিশাল নয়?

এটি আসলে কিছু নয়, শুধু আকাশছোঁয়া হিম্মত। নারী যদি চায় জান্নাতে যেতে এবং নবীর সঙ্গে থাকতে, তাহলে এর জন্য শুধু প্রয়োজন আগ্রহ ও মনোবাসনা।

ঠিক করে বলো তো! তোমার কাছেই শুধু আমি জানতে চাই! বলো! কী তোমার আশা, আকাঙ্খা? কী তোমার স্বপ্নভিলাষ? কী তোমার চাওয়া-পাওয়া? কোথায় তুমি যেতে চাও? কোন দিগন্ত তুমি স্পর্শ করতে চাও? তুমি কি একজন বড় গবেষক হতে চাও? এসো তাহলে বড় এক

গবেষণার বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই তোমাকে–

বড় গবেষণা কী, জানো কি তুমি?

তুমি শুধু নিজেকে নিয়ে বাঁচবে না, ভাববে না। বাঁচবে দীনকে নিয়ে। ভাববে দীনকে নিয়ে। তোমার ভাবনা হবে না মোজা, জুতা। তোমার ভাবনা হবে না, কেশবিন্যাস। পার্থিব সুখ-শান্তির আকাশে ডানা মেলে বেড়ানো, কিংবা কালের স্রোতের সঙ্গে গা ভাসানো– এটি তোমার কাজ নয়। তোমার কাজ, শুধু দীনের খেদমত। যেমন তুমি যদি দেখতে পাও তোমার কোনো বোন আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত, তাহলে তাকে উপদেশ দাও। অপরাধের পথ থেকে ফিরে আসতে বলো। নারীদের তুমি আলোর পথে তুলে আনতে নিজেকে উজাড় করে দাও। 'ইসলাহি দাওয়াতি মজলিস' প্রতিষ্ঠা করে সেখানে নিজের সবকুটু জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও শ্রম-সাধনা ঢেলে দাও। তাদের মাঝে ছড়িয়ে দাও ভালো ভালো সিডি, ক্যাসেট। যাকে যেভাবে কাছে টানা যায়, তাকে সেভাবে কাছে টানো। তোমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় আলোকিত করো তাদেরর মন-মানসকে-

وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿۳۳﴾

ওই ব্যক্তি অপেক্ষা কে উত্তম, যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে এবং আমলেসালেহ করে, আর বলে, আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের একজন। [সুরা হা-মিম সিজদা : ৩৩]

এটি যদি হয় তোমার মিশন, তাহলে আমি হলফ করে বলতে পারি, যেখানেই থাকো তুমি হে নারী! তুমি রানি! তুমি বরকতময়! তুমি সৌভাগ্যবতী!

আমরা তোমাকে মনে করি- পুণ্যবতী! যারা পরপুরুষের দিকে তাকায় না। দৃষ্টি রাখে নিম্নগামী। যেসব নারীর দিকে তাকালে প্রলুব্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাদের দিকেও তাকায় না। মনে রাখবে, হারাম দৃষ্টি থেকে বেঁচে

থাকায় যারা অবহেলা করে, নির্জন নারী সংস্রবকে যারা কিছুই মনে করে না, তাদেরই পড়তে হয় জেনা ও ব্যভিচারের ঝুঁকির মধ্যে। কিংবা আক্রান্ত হতে হয় নারী-সমকামিতায়! আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন।

وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿۳۲﴾

অবৈধ যৌন চাহিদার নিকটবর্তী হয়ো না। কারণ, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। [সুরা বনি ইসরাইল : ৩২]

সহিহ বুখারিতে এসেছে, নবীজি একদল নারী-পুরুষকে উনুনে দেখতে পেলেন। যার নিচের অংশ প্রশস্ত এবং ওপরের অংশ সংকীর্ণ। তারা সেখানে আর্তচিৎকার করছে। তাদের তলদেশ থেকে দাউ দাউ করে আগ্নেয়গিরি বের হয়ে আসছে। সেই উত্তাপে তাদের আর্তচিৎকার আরও বেড়ে যাচ্ছে।

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

আমি তখন বলি, জিবরাইল! এরা কারা?

তিনি বলেন, এরা ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিনী মহিলা! এই হলো এদের শাস্তি। এ শাস্তি চলতে থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত।

আখেরাতের শাস্তি বড় কষ্টদায়ক। আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা সবাই ক্ষমা চাই আখেরাতের শাস্তি থেকে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে মান্য করে দুনিয়ার কোনো কিছু তরক করবে, আল্লাহ পরকালে তার চেয়ে বহুগুণ বড় বিনিময় দান করবেন তাঁকে।

আরেক কাহিনি শোনো

আল্লামা দেমাশকি مَطَالِعُ الْبُدُوْرِ [পূর্ণিমাচাঁদের উদয়স্থল] গ্রন্থে উল্লেখ করেন, তৎকালীন কায়রোর আমির সুজাউদ্দিনের কথা। তিনি বলেন,

আমি মরুভূমিতে এক লোকের কাছে বসা। তখন তার গ্রন্থিতে বেশ বয়স হয়েছে। গায়ের রং তামাটে বর্ণের। ঠিক সেই মুহূর্তেই কয়েকটি ছেলে উপস্থিত হয় সেখানে। সুন্দর ফকফকে শুভ্র ওদের গায়ের রং। আমি জানতে চাই, এরা এমন দুধে আলতাবরণ চেহারা পেল কি করে? জবাবে তিনি বলেন, আসলে ওদের মা ইংরেজ। তার সঙ্গে আমার জীবন একই ঘাটে মিশে যাওয়ার একটা [প্রেম] কাহিনি আছে।

আমি আরও কৌতূহলী হয়ে উঠি। একাগ্রচিত্তে গল্পটা শুনতে চাই তাঁর কাছে। শুরু করেন তিনি গল্প বলা– একবার সিরিয়া যাই আমি ছিলাম তখন টগবগে যৌবনে। সিরিয়ায় ফিরিঙ্গিদের দখলদারিত্ব চলছে তখন। সেখানে গিয়ে ভাড়ায় একটা দোকান খুলে বসি। আমার ব্যবসা ছিল কাতান বস্ত্রের।

একদিন আমি দোকানে বসে আছি। এমন সময় প্রবেশ করে এক ইংরেজ মহিলা। যিনি ছিলেন এক নেতৃস্থানীয় ক্রসেডার পত্নী। আমি তাঁর রূপের ঝলক দেখে বিমোহিত হয়ে যাই। তাই তার কাছে যা বিক্রি করি, খুব কমদামে বিক্রি করি। তিনি চলে যান। কয়েক দিন পর আবার আসেন। সেইবারও আমি খাতির করি তাঁর সঙ্গে। এরপর থেকে নিয়মিতই তিনি আমার দোকানে যাতায়াত করতে থাকেন। আমি দিল খুলে তাঁকে গ্রহণ করতে থাকি। অন্যদের তুলনায় অনেক কমদামে পণ্য বিক্রি করি তাঁর কাছে। এভাবে চলতে চলতে একসময় আমি তাঁকে ভালোবেসে

ফেলি। আমার এ ভালোবাসায় যখন তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, তখন নিয়ন্ত্রণের বাঁধ ভেসে যায়। আমি আর থাকতে পারি না নীরব। অনুভব করি, আমার ভেতর যেন একটা বৃক্ষ জন্ম নিয়েছে। কচি কচি সবুজ পাতায় তা ছেয়ে গেছে। সেখানে ফোট-ফোট কলিরা চোখ মেলার অপেক্ষা করছে। আমাকে নিয়ে আমার ভেতর কিসের যেন একটা আয়োজন চলছে।

যাই হোক, সবসময় মেম সাহেবের সঙ্গে আসে এক বৃদ্ধা। একদিন তার নিকট বলে ফেলি কথাটা । আমি মেম সাহেবকে ভালোবেসে ফেলেছি! সামনে বাড়তে চাই! তুমি পথ বলে দাও!

তখন বুড়ি চোখ উল্টে আমার দিকে তাকায়। আর বলে, ইনি তো এক সেনাপতির বিবি! তিনি এসব জানতে পারলে শুধু তোমার অস্তিত্ব নয়, আমাদের অস্তিত্বও রাখবেন না!

কিন্তু আমি হাল ছাড়তে রাজি নই। বুড়িকে বিভিন্ন সহযোগিতা করতে থাকি। একসময় বুড়ি ফোকলা দাঁত বের করে হাসে। আর আমার কাছে পঞ্চাশ স্বর্ণমুদ্রা দাবি করে। কথা দেয়, বিনিময়ে মেম সাহেবকে নিয়ে সে আমার গৃহে হাজির হবে। আমি অনেক কষ্টে বিশ স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করি। এবং বুড়ির হাতে তুলে দিই।

প্রথম রাত

যে রাতে তার আগমন হওয়ার কথা আমার গৃহে, সে রাত শুরু হতেই আমি অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুনতে থাকি। অবশেষে আমার অপেক্ষার পালা শেষ হয়। মেম সাহেব আসে। কুশল বিনিময়ের পর একসঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া সারি।

রাত গভীর হওয়ার পর আমার বিবেক যেন আমাকে বলছে, তুমি কি আল্লাহকে ভয় পাও না? এক পরনারীর সামনে এমন নির্লজ্জভাবে বসে থাকতে তোমার কি একটু লজ্জাও হয় না? আল্লাহর সামনে বসে আল্লাহর সঙ্গে তুমি নাফরমানি করছ? এক খৃষ্টান নারীর প্রেমে পড়ে আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করছ তুমি?

বিবেকের চোখরাঙানিতে আমার প্রেমতরি বায়ুহীন হয়ে পড়ে। মেম সাহেবের ঘাটে ভিড়া আর আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। আকাশের দিকে তাকাই। তখন চোখ ভিজে আসে। মন নরম হয়ে যায়। মনে হয়, আল্লাহ যেন আকাশ থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি আকাশের দিকে চোখ তুলে বলি, মালিক আমার! আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, এই খৃষ্টান নারীর সঙ্গে আমি কোনো অসংলগ্ন আচরণ করব না। কেননা, আমি তোমাকে লজ্জা পাই। আমি তোমার শাস্তিকে ভয় পাই। পরক্ষণেই আমি তার কাছ থেকে দূরে সরে যাই। তথা অন্য কামরায় চলে যাই।

মেম সাহেব আমার এ আচরণ ও ভাবান্তর দেখে বিস্মিত হন। আমার দিকে ক্ষুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হনহন করে বেরিয়ে যান!

সকালে যথারীতি আমি দোকানে যাই। বেলা কিছু গড়িয়ে যেতেই দেখি, মেম সাহেব আমার সামনের পথ দিয়ে চলে যাচ্ছেন। চেহারায় প্রচণ্ড ক্ষোভ ও অসন্তোষ। ওর রূপের কথা না বলে পারছি না।

যেন চাঁদ! ওকে দেখে নতুন করে আবার আমি ভালোবাসায় ডুবে যাই। ভালোবাসার সেই বৃক্ষটা আবার আমার হৃদয়ে ডালপালা বিস্তার করে। ছায়া দিয়ে আমাকে আচ্ছন্ন করে। আমি আবার কাবু হয়ে যাই। মনকে বলি, বরং শয়তান আমাকে দিয়ে বলায়, কে তুমি? এত সাধু হয়ে গেলে যে! এ চন্দ্রমুখী চন্দ্র-সৌন্দর্য এড়িয়ে যাওয়ার মানে কি? তুমি কি খলিফা আবু বকর? ওমর? নাকি মহাসাধক জুনাইদ বোগদাদি? মহাতাপস হাসান বসরি?

তাঁর জন্য আমার হৃদয়ে আবার ভীষণ তোলপাড় শুরু হয়। ও যখন আমাকে অতিক্রম করে চলে যায়, আমি ছুটে গিয়ে আবার সেই বুড়িকে ধরি। আবার অনুরোধ করি। রাতে একটু নিয়ে এসো তাঁকে! আমার কাছে! আমার বাড়িতে! সে জিহ্বায় চাপ দিয়ে বলে, তাঁকে আবার পেতে হলে এক শ দিনার গুনতে হবে তোমাকে!

আমি মনে মনে বলি, গুনতে হয় গুনব, তবুও তাকে আনব।

আমি আবার দিনার সংগ্রহ করার জন্য লেগে যাই। এবং সফলও হই। দিয়েও দিই তাঁকে।

দ্বিতীয় রাত

দিনের আলো শেষে আসে আঁধার। শুরু হয় অপেক্ষা। তাঁর আগমনে ভাঙ্গে সেই অপেক্ষা। তাকিয়ে দেখি, সত্যিই যেন আমার বাড়িতে চাঁদ নেমে এসেছে! চাঁদের বুকে তো আছে একটা কালিমা, ওর চেহারায় শুধু আছে রূপ-ঝরানো লালিমা! কিন্তু তার পাশে এসে বসতেই আল্লাহর ভয় এসে আবার আমার ঘুমন্ত

বিবেককে জাগিয়ে তুলে। বিবেক চোখ লাল করে আমায় বলে,

ছি! এমন দুঃসাহস কি করে হয় তোমার? এক খৃষ্টান কাফের ললনার জন্য বিলিয়ে দেবে নিজের ইমান?

আমি ভয় পেয়ে যাই। আগের মতো তাকে রেখে অন্য কামরায় চলে যাই। আবার সে ক্রধান্বিত হয়ে বের হয়ে যায়।

সকালে দোকানে যাই। হৃদয় জুড়ে বিরাজ করে শুধু মেম সাহেব চিন্তা। বেলা গড়াতেই তার দেখা পাই। আমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে আগের মতোই ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে। তাঁকে দেখা মাত্রই সেদিনের মতো আবার প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত হই। তাঁকে রাতে পেয়েও হারানোর বেদনায় আক্ষেপ শুরু করি। নিজেকে তিরস্কার করতে থাকি। আক্ষেপে আক্ষেপে কেটে যায় কিছু বেলা। বেশিক্ষণ সইতে পারি না জেগে ওঠা প্রেমের দহনজ্বালা। শরণাপন্ন হই আবার বুড়ির। কিন্তু বুড়ি এবার ভীষণ চটা। বলে, তাঁকে উপভোগ করতে পারবে না পাঁচ শ স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া!

পাঁচ শ স্বর্ণমুদ্রা! আমি যে একেবারে সম্বল হারা হয়ে যাবো! তবুও বলি, কষ্ট হবে, অসুবিধে নেই। তাই হবে। তাই দেবো। তবু তুমি আয়োজন করো!

আমি দোকান বিক্রি করে পাঁচ শ স্বর্ণমুদ্রা তাঁর জন্য আলাদা করে রাখি। ঠিক তখনই এক ঘোষণা আসে কর্ণ কুহুরে। এক খৃষ্টান ঘোষক বলছে, হে মুসলিমসম্প্রদায়! তোমাদের সঙ্গে আমাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ। এখানকার মুসলিম ব্যবসায়ীদের আমরা এক সপ্তাহের ভেতর চলে যাওয়ার অনুরোধ করছি।

ঝড়েরর ওপর ঝড়! প্রেমের ঝড়েই যখন প্রায় সম্বল হারা! এখন কেন তবে এ নতুন ঝড়? ঝড়ের ভেতর বেড়ে ওঠা মানুষ আমি। তাই ঝড়কে স্বাগত জানাই। নিজের করণীয় ঠিক করি। নিজেকে প্রবোধ দিই। অবশিষ্ট মাল-পত্র গুছিয়ে সিরিয়া ত্যাগ করি।

যদিও সিরিয়াকে অনেক কষ্টে আমার বিদায় বলতে হয়।

হৃদয়ে তখন বইছে বিরহের প্রচণ্ড ঝড়! জানি না, এ ঝড় থামবে কবে! জানি না, শেষ কোথায় এর!

দেশে ফিরে আমি বাঁদীর ব্যবসা শুরু করি। এর মাধ্যমে সেই মেম সাহেবকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করি। এভাবে কেটে যায় তিনটি বছর। তারপর শুরু হয় হিত্তিন যুদ্ধ। [ইসলামের বীর সেনাপতি, ক্রুসেডারদের আতঙ্ক গাজি সালাহুদ্দিন আইয়ুবির নেতৃত্বে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধেই ক্রুসেডারদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়।] মুসলমানরা ফিরে পায় উপকূলীয় শরহ। বিজয়ী বাদশাহর জন্য বাঁদী তলব করা হয় আমার কাছে। এক শ দিনারের বিনিময়ে আমি এক অপরূপা বাঁদী তাঁর হাতে তুলে দিই। আমাকে নব্বই দিনার পরিশোধ করে। দশ দিনার বাকি রাখে। বাদশাহ আমাকে দেখিয়ে বলে, আমাদের সঙ্গে একেও নিয়ে চল। যেখানে আমরা খৃষ্টান নারীদের বন্দী করে রেখেছি সেথায়। সেখান থেকে সে একটি খৃষ্টান বাঁদী বেছে নিতে পারবে নিজের পছন্দমতো বাকি দশ দিনারের পরিবর্তে।

পুরস্কার ও বিনিময়

আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় সেই গৃহে, যে গৃহে খৃষ্টান নারীদের বন্দী করে রাখা হয়েছে। ঢুকতেই দেখি, হায়! এ যে আমার হারানো মেম সাহেব! তিনি বন্দিনী! তিনি আমাকে চিনতে পারেননি; কিন্তু আমি তাঁকে চিনে ফেলেছি। আমি দশ দিনারের পরিবর্তে তাঁকেই বেছে নিই। তাঁর পূর্ণ মালিক হয়ে তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করি,

আমাকে চিনতে পেরেছেন আপনি?

সে বলে, না।

আমি আপনার সেই কাতান ব্যবসায়ী! যার কাছ থেকে আপনি দুবার দেড় শ দিনার ভাগিয়ে নিয়েছিলেন। তৃতীয়বার বলেছিলেন, আমাকে পেতে হলে পাঁচ শ দিনার দিতে হবে! অথচ আজ আমি মাত্র দশ দিনারের পরিবর্তে আপনার মালিক হয়ে গেলাম!

আমার কথা যখন শেষ হয়, তখন দেখি, তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। ঠোঁট কাঁপা কাঁপা। একটু পরই বুঝি– কেন এই ছলছলানি! পরক্ষণেই তিনি উচ্চকণ্ঠে বলেন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহ।

হ্যাঁ, আমার মেম সাহেব মুসলমান হয়ে গেলেন। মনে প্রাণে। এরপর আমরা উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই।

কিছুদিন যেতে না যেতে তাঁর মা একটি ছোট্ট বাক্স পাঠায়। তাতে দুটি থলে থাকে। একটিতে পঞ্চাশ দিনার, আরেকটিতে এক শ দিনার। কুদরতের কারিশমায় আমি মনে মনে হাসি। বুঝি, সব হয়েছে তাঁরই ইশারায়! ফেরত পেয়েছি সবই তাঁর কারিশমায়! মজার ব্যাপার, যে জামাটি শরীরে জড়িয়ে সে আমার মন লুটে নিয়েছিল, সেই জামাটিও ওই ছোট্ট বাক্সে ছিল।

হ্যাঁ ভাই! তোমাকে আমি এক লম্বা গল্প শুনালাম। এই যে দেখছ আমার আশপাশে এই ছেলেদের, এরা সবাই মেম সাহেবের-ই সন্তান।

আসলে বান্দা যদি আল্লাহর নির্দেশ পালনে কোনো কিছু ছেড়ে দেয়, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তাঁকে তার বদলা দেন। বিনিময় দান করেন। আল্লাহর ভয়ে আমি মেম সাহেবকে গভীর ভালোবেসেও নিজে কলুষিত হইনি। তাই আল্লাহ আমাকে বদলা দিয়েছেন। বান্দা

অনায়াসে নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারে আরেকজন বান্দার কাছ থেকে। কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে কেউ নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারে না। লুকিয়ে রাখতে পারে না। যেখানেই যাক এবং যে অবস্থায়ই থাকুক, তা আল্লাহর কাছে একটুও গোপন থাকে না।

সলিলসমাধির মহিমা!

সতী-সাধ্বী নারীর সম্ভ্রম ধ্বংস করা যায় না। তার সম্মান হানি করা যায় না। সতীত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষার প্রশ্নে প্রয়োজনে সে জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। খাত্তাবি তার বিখ্যাত عَدَالَةُ السَّمَاءِ [আকাশের বিচারালয়] গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

চল্লিশ বছর পূর্বে বাগদাদে পরিচিত এক কশাই ছিল। ফজরের আগেই সে নিজের দোকানে চলে যায়। ছাগল জবাই করে। এরপর রাত থাকতে থাকতেই আবার বাড়ি ফিরে। সূর্যোদয়ের পর আবার দোকান খুলে বসে, গোশত বিক্রির জন্য।

একদিন ছাগল জবাই করে সে বাড়ি ফিরছে। তখনও রাতের আঁধার কাটেনি। আজ অনেক রক্ত লেগেছে তার জামায়। পথিমধ্যে সে এক গলির ভেতর থেকে কাতর একগোঙানি শুনতে পায়। ওই গোঙানি সে অনুসরণ করে। হঠাৎ সে একটা দেহের সঙ্গে ধাক্কা খায়। দেখে, রক্তাক্ত এক লোক পড়ে আছে মাটিতে। গুরুতর যখম। বাঁচাতে হলে দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন। অনরগল রক্ত বের হচ্ছে। ছুরিকাঘাত। ছুরিটা এখনও দেহে গেঁথে আছে। দ্রুত সে ছুরিটা ঝটকা টান মেরে বের করে ফেলে। তারপর লোকটাকে তুলে নেয় কাঁধে। কিন্তু লোকটা তার

কাঁধেই মারা যায়।

এরপরের ঘটনাপ্রবাহ : লোকজন জড়ো হয়। কশাইয়ের হাতে ছুরি। সদ্যমৃত লোকটির গায়ে তাজা রক্ত। এসব দেখে লোকজনের স্থির ধারণা হয় যে, এই এর ঘাতক। অগত্যা তাকে হন্তারক হিসেবে অভিযুক্ত হতে হয়। তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। যখন মৃত্যুদণ্ডের মঞ্চে আনা হয়, তখন সে জনতার উদ্দেশে বলে ওঠে,

হে উপস্থিত জনতা! আমি এ লোককে হত্যা করিনি। তবে আজ থেকে বিশ বছর আগে আমি অপর একটি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছি। আজ যদি আমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়, তাহলে এর পরিবর্তে মোটেও নয়; বরং ওর পরিবর্তে।

অতঃপর সে তার বিশ বছর আগের হত্যার ঘটনা বলা শুরু করে এভাবে–

আজ থেকে বিশ বছর আগে আমি ছিলাম এক টগবগে যুবক। নৌকা চালাতাম। লোকজনকে পারাপার করাতাম। একদিন এক ধনবতী যুবতী তাঁর মাকে নিয়ে আমার নৌকায় পার হয়। পরদিন আবার তাঁদের পার করি। এভাবে প্রতিদিনই আমি তাঁদের পারাপার করাতাম। এ পারাপারের সুবাদে যুবতীর সঙ্গে আমার আন্তরিকতা ও ভালোবাসা গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে আমরা একে অপরকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলি। এক সময় আমি তাঁর পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিই। কিন্তু আমার

মতো এক দরিদ্র মাঝির কাছে মেয়ে দিতে অস্বীকার করে তার পিতা। এরপর আমাদের যোগাযোগ হয়ে যায় বিচ্ছিন্ন। সেও আর আসে না। তার মাও আর আসে না। সম্ভবত মেয়ের বাবা নিষেধ করে দিয়েছেন। আমি অনেক চেষ্টা করেও তাকে ভুলতে পারি না। এভাবে কেটে যায় দুই থেকে তিন বছর। একদিন আমি নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করি আরোহীর জন্য। এমন সময় দেখি, এক মহিলা ছোট্ট এক মেয়েকে নিয়ে ঘাটে উপস্থিত। আমাকে বলে, নদী পার করে দিতে। আমি তাকে নিয়ে রওনা হই। মাঝ নদীতে এসে তাকাই তার চেহারার দিকে। চিনতে দেরি হয় না। আরে, এ যে আমার সেই প্রেয়সী! এর পিতা আমাদের মাঝে বিচ্ছেদের পর্দা টেনে না দিলে আজ এ আমার স্ত্রী হতো। আমি তাকে দেখে খুশি হই। বিভিন্ন মধুময় স্মৃতির ডালি একে একে তার সামনে মেলে ধরি। সে উত্তর দেয় খুব সতর্কতার সঙ্গে ও বিনয়ের সঙ্গে। সে একটু পর জানায়, সে বিবাহিতা এবং সঙ্গের শিশু তারই সন্তান।

তখন আমার হৃদয় বড় অস্থির হয়ে ওঠে। আমি নিজেকে করতে পারি না নিয়ন্ত্রণ। অশুভ এক ইচ্ছা আমাকে তাড়া করে। আমিও হই তাড়িত । একপর্যায় যৌন ক্ষুধা নিবারণের জন্য আমি তার ওপর চাপাচাপি শুরু করি। সে আমাকে মিনতি করে বলে,

আল্লাহকে ভয় করো! আমার সর্বনাশ করো না!

আমি মানি না। আমি ফিরি না। তখন অসহায় নারী শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাকে প্রতিরোধের চেষ্টা করে । তার শিশুকন্যা চিৎকার শুরু করে।

আমি তখন তার শিশুকন্যাকে শক্ত ভাবে ধরে বলি,

তুমি আমার আহ্বানে সাড়া না দিলে, তোমার সন্তানকে আমি পানিতে ডুবিয়ে মারব এখন।

তখন সে ডুকরে কেঁদে ওঠে। হাত জোড় করে মিনতি জানাতে থাকে। কিন্তু আমি এমনই এক অমানুষে পরিণত হই যে, নারীর অশ্রু ও কান্না কিছুই আমার কাছে আমার প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার চেয়ে বেশি মূল্যবান মনে হয় না। আমি নিষ্ঠুরভাবে শিশুকন্যার মাথা পানিতে চেপে ধরি। মৃত্যুর উপক্রম হতেই আবার বের করে আনি। বলি,

দ্রুত রাজি হও। নইলে একটু পর এর লাশ দেখবে তুমি!

কিন্তু সন্তানের মায়ায় এবং সতীত্বের ভালোবাসায় অশ্রু ও বিলাপের অস্ত্র বারবার সে ব্যবহার করতে থাকে, যা আমার কাছে ছিল অর্থহীন। আমি আবার শিশুকন্যার মাথাকে পানিতে চেপে ধরি। শিশু হাত-পা নাড়ছে। জীবনের বেলাভূমিতে অনেক দিন হাঁটার স্বপ্নে দ্রুত হাত-পা ছুড়ছে। কিন্তু ওর জানা ছিল না– কেমন হিংস্র প্রাণীর হাতে পড়েছে ও। এবার আমি আর তার মাথা তুলে আনি না। ফল যা হবার তাই হয়! কিছুক্ষণের মধ্যেই নিথর নিস্তব্ধ হয়ে যায়! আমি এবার তাকাই তার দিকে। কিন্তু মেয়ের করুণ মৃত্যুও তাকে টলাতে পারে না। সে তার সিদ্ধান্তে থাকে অটল! ওর দৃষ্টি যেন বলছে, সন্তান গিয়েছে, প্রয়োজনে আমিও যাব! জান দেবো! তবু মান দেবো না!

কিন্তু আমার মনুষ্যত্ব হারিয়ে গেছে। বিবেক ঘুমিয়ে গেছে, গভীর সুপ্তির কোলে। আমার মাঝে রাজত্ব করছে শুধু আমার পশুত্ব। আমি নেকরের মতো তার দিকে এগিয়ে যাই। চুলকে ধরি মুষ্টিবদ্ধ করে। তারপর তাকেও পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে বলি। ভাবো জলদি!

জীবনের মায়া যদি করো, তবে আবার ভাবো!

সে আমার মুখের ওপর ঘৃণাভরে বলে দিল, না। আমিও ধরে রাখি তাকে চেপে। এক সময় আমার হাত ক্লান্ত হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ওর দেহও নিথর হয়ে যায়! আমি ওকে পানিতে ছুড়ে গন্তব্যে ফিরে আসি।

আমার অপরাধের কথা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না।

মনে রাখবেন, মহান সত্তা যিনি, তিনিও বান্দাকে সুযোগ দেন, ছুঁড়ে ফেলে দেন না। সেই সত্তাই একদিন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত পার্থিব জগতেই মানুষকে দেখিয়ে দেন।

এ করুণ কাহিনি শুনে উপস্থিত সবাই চোখ মুছতে থাকে। আর বলে, আহ্! এ বলে কী? এর পরপরই তার শিরোচ্ছেদ করা হয়।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ،

তুমি কখনো ভেবো না, জালিমরা যা করে, সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ গাফেল। [সূরা ইবরাহিম : ৪২]

দেখলে, সতীত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষায় সতী নারীরা কত আপোষহীন? নিজের চোখের সামনে জীবন গেল; বুকের ধন ছোট্ট শিশুকন্যার, তবুও সে করেনি আপোষ! নিজের জীবনও দিয়েছে বিলিয়ে, তবুও দেয়নি নিজের ইজ্জতের বিসর্জন!

মনে রাখবে, সতী নারীরা এমনই হয়। তবে হায়, এতেও হবে কি তোমার হুঁস!

ধন্য তুমি হে ফেরিওয়ালা!

ইবনুল জাওজি তার 'মাওয়ায়েজে' উল্লেখ করেন,

দরিদ্র এক যুবক রাস্তায় ফেরি করে বারোয়ারি জিনিস বিক্রি করত। সে একদিন একটি বাড়ির সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় এক মহিলা উঁকি দেয়। তার কাছে আছে কী, জানতে চায়। কী কী আছে, সেও জানায়। মহিলা ভেতরে গিয়ে তাকে জিনিস দেখাতে বলে। সে ভেতরে ঢুকতেই দরজা আটকে দেয় মহিলা। প্রস্তাব দেয়, ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার। ফেরিওয়ালা পরিস্থিতির আকস্মিকতায় হয়ে যায় থ। বলে, অসম্ভব! আমি এমন মানুষ নই।

মহিলা চোখ লাল করে বলে,

কী হবে একটু ভেবে দেখো! রাজি না হলে কিন্তু আমি চিৎকার দেব! লোক জড়ো করে আমি বলব, তুমি আমার ওপর অসৎ উদ্দেশে চড়াও হয়েছ! তখন মৃত্যু ছাড়া তোমার সামনে আর কোনো পথ খোলা থাকবে না! বুঝলে?

সে বলে, হে নারী! আল্লাহকে ভয় করো!

কিন্তু মহিলা আল্লাহকে ভয় করে না। তার দাবি থেকে সে চুল পরিমাণও সরে আসে না। লোকটি পেরেশান হয়ে এদিক ওদিক দেখে। এরপর বলে,

আমাকে কি একটু শৌচাগারে তুমি যেতে দেবে?

আমার যে ইস্তিঞ্জা চাপছে! তুমি একটু অপেক্ষা করো। আর না বলতে পারে না মহিলা। লোকটি শৌচাগারে ঢুকে দেহে ও কাপড়-চোপড়ে পায়খানা মেখে বের হয়ে আসে! এ অবস্থা দেখে ঘৃণায় ছি ছি করে ওঠে মহিলা। এবং

দ্রুত তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়।

লোকটি বারোয়ারি পসরা ফেলেই বেরিয়ে যায়। এবং দৌড়ে তার আবাসস্থলের দিকে যেতে থাকে। পথশিশুরা দেখে সমস্বরে বলে ওঠে, দেখ দেখ, একটা পাগল যাচ্ছে।

এ 'পাগল' বাড়িতে এসে সবকিছু ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। কিন্তু এ কী! তার সারা শরীর জুড়ে যে মেশকনামীয় আম্বরের সুঘ্রাণ!

ইতিহাসে উল্লেখ আছে, লোকটির দেহ থেকে সবসময় এ সুগন্ধি বের হতো।

কোথায় হারিয়ে গেল আমাদের সেই সোনালি দিনগুলো! এখন তো নারী, পুরুষ এক টেলিফোন সংলাপেই বিকিয়ে দেয় নিজের সম্ভ্রম!

এ দুনিয়ার এ মিথ্যা স্বাদে কেন হারিয়ে যাচ্ছ তুমি!

আখেরাতের সুখ-প্রাসাদ ছেড়ে?

এত অবলা তুমি? এত অদূরদর্শী তুমি? এত অসাবধান তুমি? এত বোকা তুমি? বোকা হয়েও নিজেকে চালাক ভাবো?

কবে হবে তোমার সুমতি?

নারী যখন তওবার অশ্রুতে হাসে!

ইবনে কুদামাহ রচিত 'আত তাওয়াবুনা' নামীয় গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন,

কিছু দুষ্টুপ্রকৃতির মানুষ সুন্দরী এক নারীকে রবি ইবনে খায়সাম নামের এক ব্যক্তির পেছনে লেলিয়ে দেয়। বলে, যদি তুমি রবি ইবনে খায়সামকে তোমার রূপেরবাহারে মুগ্ধ করে পদস্খলিত করতে পারো, তাহলে তোমাকে এক হাজার দেরহাম পুরস্কার দেওয়া হবে।

সেই নারী তখন আবেদনময়ী অনেক দামী কাপড় পরে, উন্নতমানের সুগন্ধি মেখে, তার সামনে হাজির হয়। রবি ইবনে খায়সাম তখন মসজিদ থেকে বের হয়ে বাড়িতে যাচ্ছিলেন। এ অবস্থায় সেই মহিলাকে দেখে তিনি ভয় পেয়ে যান। বলেন, বলো দেখি, তোমার কী অবস্থা হবে, এখন যদি তুমি এমন জ্বরে আক্রান্ত হও, যদ্দরুন তোমার এ রূপেরবাহার হয়ে যায় একেবারে নিঃশেষ?

কিংবা যদি এমন হয় যে, ফেরেশতা নামীয় মৃত্যুদূত এসে এখন তোমার হৃদ্‌পিণ্ডের সচলতাকে বন্ধ করে দেয়? যদি মুনকির-নাকির তোমার সঙ্গে মন্দব্যবহার শুরু করে?

তখন যুবতী চিৎকার করে কেঁদে ওঠে এবং তাঁর সম্মুখ থেকে দ্রুত সরে যায়। তারপর সম্পূর্ণ বদলে যায় তাঁর অবশিষ্ট জীবনধারা। ইবাদতে ইবাদতে কাটে তাঁর বেশিরভাগ বেলা। এ অবস্থা থাকে তাঁর মৃত্যুপর্যন্ত।

আজালি তার ইতিহাস গ্রন্থে আরও লেখেন, এক রূপসী বসবাস করত মক্কায়। তার সংসার ছিল। একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্বামীকে বলে, এ রূপ দেখে কে না আসক্ত হবে?

স্বামী বলে, ঠিক বলেছ তুমি।

স্ত্রী বলে, বলো, কে আসক্ত হতে পারে?

স্বামী বলে, সবাই। এমনকি উবায়দ ইবনে উমায়েরও! যিনি সারাক্ষণ কাবার আঙিনায় থাকেন ইবাদতে মগ্ন।

স্ত্রী এবার বলে, আচ্ছা, আমি যদি সত্যি সত্যি তাঁকে আকৃষ্ট করতে আমার চেহারা তাঁর সামনে মেলে ধরি, তাহলে তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে?

স্বামী বলে, হ্যাঁ, পারলে করো!

মহিলা একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করার ছুতোয় তখন মসজিদুল

হারামের এক কোণে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। সুযোগ বুঝে হঠাৎ নিজের চেহারার নেকাব খুলে ফেলে। পুরো চাঁদের ন্যায় ঝলক! তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহর বান্দী! তোমার চেহারা আবৃত করো! আল্লাহকে ভয় করো!

তখন মহিলা উত্তর দেয়, আমি আপনার সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ! আমি আপনার প্রেমে পড়েছি!

তিনি বলেন, শোনো! আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। যদি সঠিক উত্তর দিতে পারো, তাহলে আমি তোমার বিষয়টি ভেবে দেখব।

মহিলা তখন বলে, বলুন কী জানতে চান? আমি সত্য সত্য-ই উত্তর দিব।

তিনি বলেন, যদি মৃত্যুদূত এসে তোমার রূপসজ্জা কবজা করে, তাহলে তুমি কি সেই অবস্থায়ও চাইবে, আমি তোমার প্রেমের ডাকে সাড়া দিই? মহিলা বলে, না।

তিনি বলেন, তোমাকে যদি কবরে মুনকির-নাকিরের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য বসানো হয়, তখন কি তুমি চাইবে আমি তোমার কু-প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দিই?

সে বলে, না।

তিনি বলেন, হাশরের মাঠে যখন আমলনামা দেওয়া হবে, তখন তোমার জানা নেই, কোন হাতে তুমি আমলনামা পাবে- ডান হাতে না বাম হাতে, তখন কি তুমি তোমার এমন রূপ নিয়ে আমাকে কাবু করতে আসবে?

সে বলে, না।

তিনি বলেন, হাশরের ময়দানে যখন মানুষের পাপ-পুণ্য মাপা হবে,

তোমার জানা নেই তোমার পাল্লা হালকা হবে না ভারী, তখন কি তুমি পারতে রূপের এমন বড়াই নিয়ে আমাকে বিভ্রান্ত করতে?

সে বলে, না।

তিনি তখন বলেন, মনে কর, তুমি যদি দাঁড়াতে আল্লাহর সামনে তাঁরই প্রশ্নের উত্তর দিতে, তখন সেই মুহূর্তে এখন যে উদ্দেশে এসেছ, তখন কি তা করতে পারতে?

সে বলে, না।

এবার তিনি বলেন, তাহলে হে আল্লাহর বান্দী! আল্লাহকে ভয় করো! আল্লাহ তোমাকে যে নেয়ামত দান করেছেন, তার শোকর আদায় করো। আল্লাহর নেয়ামত নিয়ে ঠাট্টা করো না।

মহিলা তখন স্বামীর কাছে ফিরে যায়। স্বামী বলে, কী করে এলে? বলো!

জবাবে স্ত্রী বলে, আমরা সবাই এখানে নিষ্কর্মা, অথচ মানুষ ইবাদতে মগ্ন। আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করছে। আমরা আর এ অবস্থায় বসে থাকতে পারি না।

এরপর তাঁর ইবাদত-বন্দেগি অত্যধিক বেড়ে যায়। কখনো সে থাকে সালাতে মগ্ন। কখনো থাকে সিয়াম-সাধানায়। তবে সবসময় মুখাবয়বে ভেসে বেড়ায় শুধু অতৃপ্তি আর অতৃপ্তি। আর মনে মনে চিন্তা থাকে শুধু আমি কি আমার রব-এর হুকুম ঠিকঠাক আদায় করছি তো?

হে নারী! সুসংবাদ যদি হতো তোমার নিত্যসঙ্গী!

যখন নারী সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক গভীর করবে, মনে-প্রাণে তাঁকে ভয় করবে, পাপপঙ্কিলতা থেকে বেঁচে থাকবে, পাপ কখনো হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করবে, আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে, ভয় করবে পাপের ভয়ংকর পরিণামকে স্মরণ করে করে, বর্জন করবে ক্ষণিকের স্বাদকে, তাহলে আল্লাহ তাঁকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন। তাঁর দোষত্রুটি লুকিয়ে রাখবেন। বান্দা আল্লাহর কাছে তওবা করলে আল্লাহ ভীষণ খুশি হন। বোখারি ও মুসলিম শরিফে, এক মহিলা সাহাবির তওবার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এভাবে–

বিবাহিতা এক নারী। থাকেন মদিনায়। একদিন শয়তান দেয় কুমন্ত্রণা। একজন লোকের প্রতি তাঁর হৃদয় আসক্ত হয়ে পড়ে। লোকটিও একটু আগে বাড়ে। সেও একটু অগ্রসর হয়। একদিন সুযোগ বুঝে লোকটি তাঁকে নিয়ে এক নির্জন স্থানে চলে যায়। সেখানে তাঁরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। অবশ্য শয়তান আছে। শয়তান তো থাকবেই। কারণ, নির্জনে নারী-পুরুষ দুজন একত্র হলে, শয়তান তো সেখানে এসে হাজির হবেই। এটিই তো তার মিশন। ফলে চোখের আড়াল থেকে শয়তান ওই দুজনকে ধীরে ধীরে পরস্পরের প্রতি বিমোহিত করে তুলে। শেষ

পর্যন্ত তাঁরা শয়তানের ফাঁদে পা দেয়। ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।

তিনি ছিলেন না কোনো সাধারণ মহিলা। ছিলেন নবীজির সান্নিধ্য পাওয়া একজন সাহাবিয়্যাহ। তাই একটু পরই তাঁর হুঁশ হয়। ততক্ষণে শয়তান তার কাজ সেরে চলে যায়। পাপ কাজ সংঘটিত হওয়ার পর আর শয়তান সেখানে থাকে না। অন্য জায়গায় নতুন ফাঁদ পাতে। এখানেও হয় তাই। শয়তান চলে যাওয়ার পর মহিলার ভেতর শুরু হয় তোলপাড়। পাপবোধে তাঁর মন-মানস অন্ধকার হয়ে আসে। নিজের অস্তিত্বকে মনে হতে থাকে অসহ্য। শ্বাস-নিশ্বাস নিচ্ছেন ঠিকই। কিন্তু যেন দম বারবার আটকে আসছে। হৃদয় পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। কোথাও ইচ্ছে করছে না বসতে। কোথাও ইচ্ছে করছে না দাঁড়াতে। কিছু খেতেও করছে না ইচ্ছে। কারও সঙ্গে কথাও বলতে লাগছে না ভালো। এভাবে আর কিছুক্ষণ থাকলে যেন মারা যাবেন তিনি। তাই আর বিলম্ব না করে দ্রুত ছুটে যান চিকিৎসকের কাছে। সায়্যিদুনা রসুল (সা.)-এর কাছে। রহমাতুললিল আলামিনের কাছে। উদ্বেগমাখা কণ্ঠে বলেন,

يَارَسُوْلَ اللهِ ... زَنَيْتُ ... فَطَهِّرْنِيْ...

হে আল্লাহর রসুল! আমি জেনা করে ফেলেছি। আমাকে পবিত্র করুন। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা শুনেও না শোনার ভান ধরে মুখ ফিরিয়ে নেন। কিন্তু যেদিকে নবীজি মুখ ফিরিয়ে নেন সে দিকে গিয়ে আবার তিনি বলেন–

يَارَسُوْلَ اللهِ ... زَنَيْتُ ... فَطَهِّرْنِيْ...

হে আল্লাহর রসুল! আমি জেনা করে ফেলেছি। আমাকে পবিত্র করুন।

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার মুখ ফিরিয়ে নেন। তিনি এমনটি করলেন এ উদ্দেশে, যেন মহিলা ফিরে গিয়ে একনিষ্ঠ হৃদয়ে তওবা করে।

আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। মহিলা এরপর গৃহে ফিরে যায়। কিন্তু ফিরে গেলেও পাপবোধের অসহ্য আগুনে দগ্ধ হচ্ছিল সে। তাঁর কিছুই ভালো লাগে না। ধৈর্যের বাঁধ বারবার ভেঙে যেতে থাকে। পরদিন নবীজি যখন মজলিসে বসেন, আবার গিয়ে বলেন,

يَارَسُوْلَ اللهِ ... زَنَيْتُ ... فَطَهِّرْنِيْ...

হে আল্লাহর রসুল! আমি জেনা করে ফেলেছি। আমাকে পবিত্র করুন। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবারও ফিরিয়ে নেন মুখ। তখন তিনি বলে ওঠেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনি কি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন, যেমন দিয়েছেন মায়েজকে? আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি! ব্যভিচারের দরুন এখন আমি গর্ভধারিণী!

এবার আল্লাহর রসুল তাঁর দিকে তাকান। বলেন, এখন নয়, এখন চলে যাও। সন্তান জন্মগ্রহণের পর এসো।

তিনি তখন মসজিদ থেকে বের হন। কিন্তু চলতে চায় না পা, তবুও টেনে টেনে ফিরে যান গৃহে। দুশ্চিন্তা দিন দিন বাড়তে থাকে। শরীর ভেঙে পড়ে। দগ্ধহৃদয় থেকে অশ্রুধারা বইতে থাকে। আর গুনতে থাকেন দিন। কিন্তু হতে চায় না শেষ। মনে মনে জন্ম নেয় বেদনার বৃক্ষ। তওবা ছাড়া মৃত্যুর আশঙ্কায় বারবার কেঁপে ওঠে সেই বেদনাবৃক্ষের ডালপালা।

এক সময় অপেক্ষার নীল প্রহর শেষ হয়। আসে প্রসবকাল। ভূমিষ্ঠ হয় সন্তান। তর সয় না আর। ছুটে যান নবজাতককে কোলে নিয়েই—আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে।

নবজাতককে রাখেন তাঁর সামনে। বলেন,

يَارَسُوْلَ اللهِ ... زَنَيْتُ ... فَطَهِّرْنِيْ...

হে আল্লাহর রসুল! আমি জেনা করে ফেলেছি। আমাকে পবিত্র করুন।

দয়ার নবী একবার তাকান তাঁর দিকে, আরেকবার তাকান দুগ্ধপুষ্য শিশুর দিকে। দেখেন তাঁর দুরাবস্থা। তাঁর দুশ্চিন্তা ও অনুশোচনাঘেরা ক্লান্তি আর ব্যাকুলতা! আবার শিশুর দিকে তাকান। ভাবেন, দুগ্ধপুষ্য শিশু! কেমনে চলবে মাহীন তার জীবন! তাই বলেন,

ফিরে যাও। দুধ পান করাতে থাকো। দুধ ছাড়ানোর পর এসো।

চলে গেলেন আবার। ফিরে গেলেন গৃহে। এবার শুরু হয় দুধ পান করানোর কঠিন দু বছর। সহজে কি শেষ হতে চায়? নবজাতকের মায়াভরা মুখ দেখে, নীরবে অশ্রুপাত হতে থাকে। বিদায়ী চাহনির অভিব্যক্তিতে তাকে প্রতিদিন বিদায় জানাতে জানাতে একসময় শেষ হয়ে আসে অপেক্ষার পালা। তাকে কোলে নিয়ে ছুটে যান আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট। বলেন, হে আল্লাহর নবী! আমি-এর দুধ ছাড়িয়ে এসেছি। এবার আমাকে পবিত্র করুন!

আল্লাহর নবী তখন তাঁর সন্তানকে একজনের দায়িত্বে সঁপে দিয়ে, তাঁকে বুক পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে প্রস্তরাঘাতের নির্দেশ দেন। প্রস্তরাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

হ্যাঁ, তিনি চলে গেছেন পরপারে! গোসল দেওয়া হয়েছে তাঁকে। দাফন করা হয়েছে। আল্লাহর নবী স্বয়ং তাঁর জানাজার সালাত পড়ান। আর বলেন, সে তওবা করেছে এমন, যা; বণ্টন করে দেওয়া যাবে মদিনার সত্তরজন তওবাকারীর মাঝে।

পাবে কি তুমি এমন কাউকে, যে তওবার পথে নিজের জীবনই বিলিয়ে দিয়েছে! স্বেচ্ছায়! এমন মরণ! কার ভাগ্যে হয় বরণ!

হে মহীয়সী! ধন্য তুমি ধন্য! লিপ্ত হয়েছিলে ব্যভিচারে। ছিন্ন করে দিয়েছিলে আল্লাহর পর্দা। তারপর? তারপর অন্ধকার থেকে শুধু আলোর দিকেই দৌড় ছুটেছ!

ব্যভিচার! ওহ্! কী ভয়ংকর কাজ। ক্ষণিকের স্বাদ দূর হয়ে গেলে– কী থাকে আর! দীর্ঘশ্বাস ও নীলবেদনার যন্ত্রণা ছাড়া? পরকালে সাক্ষী যখন দিবে মানুষের হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তখন গোপন থাকবে কি ব্যভিচারের কথা? সাক্ষী দিবে পা, সাক্ষী দিবে হাত, সাক্ষী দিবে জিহ্বা, এক কথায় সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। বাঁচার কোনো উপায় নেই। সুতরাং দুনিয়াতেই এ কু-কর্ম থেকে বাঁচতে হবে। গড়তে হবে পরকাল। ভয় করতে হবে জাহান্নামের কঠিন আগুন। যেদিন ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারীকে হাঁটুর পেছন দিকের পেশিতন্ত্রের সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হবে জাহান্নামে। চলতে থাকবে লোহার বেত্রাঘাত। প্রহারে প্রহার অসহ্য হয়ে যখন তাদের কেউ চাইবে পানাহ, তখন ফেরেশতারা ঘোষণা করবে,

أَيْنَ كَانَ هَذَا الصَّوْتُ وَأَنْتَ تَضْحَكُ... وَتَفْرَحُ..وَتَمْرَحُ...وَلَاتُرَاقِبُ اللهَ وَلَاتَسْتَحِيْ مِنْهُ...

কোথায় ছিল তোমার এ কণ্ঠ, যখন 'আনন্দে' হাবুডুবু খাচ্ছিলে? না, পরওয়া করছিলে তুমি আল্লাহকে, না হয়েছিলে তুমি লজ্জিত কৃতকর্মের কারণে?

বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ... وَاللَّهِ إِنْ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ... أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ... أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ... يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا.

হে উম্মতে মুহাম্মদী! আল্লাহর কোনো বান্দা বা বান্দী ব্যভিচারে লিপ্ত

হলে আল্লাহর আত্মসম্মান কেঁপে ওঠে। আল্লাহ যে সবচেয়ে বড় আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন? হে উম্মতে মুহাম্মদী! আমি যত গভীরের জিনিস জানি, তোমরা তা জানলে কমই হাসতে, কেবল কাঁদতে আর কাঁদতে।

তাকাও আশপাশে

সেই যুগের নারীরা এমনই ছিলেন। পাপ হয়েছে তো, সঙ্গে সঙ্গে এসেছে তওবা করার জন্য। কিন্তু একটু ভাবো, বর্তমান যুগের নারীদের নিয়ে? তাদের অবস্থা নিয়ে? তাদের তো দেখি এদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। তাদের মধ্যে অনেকের পা ফসকে গেছে, ঢুকে গেছে পাপাচারের পিচ্ছিল জগতে, বরং তাদের আশপাশে শয়তান জায়গা করে নিয়েছে বেশ স্বাচ্ছন্দে, তারপর তাদের বিপথগামী করেছে, বের করে দিয়েছে ইসলামের রক্ষিত সীমানা থেকে, বাধ্য করেছে মূর্তিপূজায়। তখন মূল্যহীন হয়ে গেছে নামাজের গুরুত্ব তাদের কাছে। অথচ আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ اَلصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

আমাদের এবং কাফেরদের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয়কারী হলো সালাত। সুতরাং যে সালাত ছেড়ে দিল, অবশ্যই সে কুফুরি করে ফেলল।

একটু ঘুরে আসা যাক পরকাল থেকে। যাবে! হ্যাঁ, এগিয়ে যাও! আরও সামনে যাও! তারপর জান্নাত ও জাহান্নামবাসী সম্পর্কে আল্লাহ কী বলেছেন– তা নিয়ে চিন্তা করো,

জান্নাতবাসীরা যখন জান্নাতে বসে জান্নাতের সুখ-আনন্দ ও ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকবে, তখন তাদের মনে পড়ে যাবে দুনিয়ার জীবনের কিছু সঙ্গিসাথির কথা। ওরা কেমন আছে এখন কে জানে!

ফেরেশতারা বোঝে জান্নাতবাসী কখন কী চায়! জান্নাতবাসীদের মনের কথাও তাদের অজানা নয়। সঙ্গে সঙ্গে জান্নাতবাসীদের জানানো হবে,

তারা খুব কষ্টে আছে। জাহান্নামের আগুনে পুড়ছে। জাক্কুম ভক্ষণ করছে। শয়তানের সঙ্গে ওদের রাখা হয়েছে শৃঙ্খলিত করে।

জান্নাতবাসীদের কৌতূহল তখন আরও বেড়ে যাবে। তারা উঁকি দিবে, জান্নাতের খিড়কি দিয়ে। জিজ্ঞেস করবে সেই জাহান্নামিদের–

مَاسَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ

[তোমাদের কিসে সাকার-এ নিক্ষেপ করেছে?]

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ فِيْ جَنّٰتٍ يَتَسَآءَلُوْنَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ

প্রত্যেক ব্যক্তি দায়বদ্ধ হবে নিজের কৃতকর্মের। তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ ব্যতীত। তারা থাকবে উদ্যানে [জান্নাতে], তারা জিজ্ঞেস করবে অপরাধীদের, তোমাদের কিসে সাকার-এ নিক্ষেপ করেছে?

হ্যাঁ, প্রশ্ন করা হবে; مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ [তোমাদের কিসে সাকার-এ নিক্ষেপ করেছে?]

জবাব শোনো,

প্রথমত : قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ [তারা বলবে, না। আমরা নামাজিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।]

দ্বিতীয়ত : وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ [না। আমরা অভাবগ্রস্তদের আহার দিতাম না।]

তৃতীয়ত : وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ [হ্যাঁ, আমরা আলোচনাকারীদের সঙ্গে আলোচনা করতাম।] অর্থাৎ ওরা যা করে, আমরাও তাই করতাম। তারা

সালাত ছেড়ে দিলে আমরাও সালাত ছেড়ে দিতাম। তারা আল্লাহর নাফরমানি করলে আমরাও আল্লাহর নাফরমানি করতাম। ওরা গান গাইলে আমরাও গান গাইতাম। ওরা ধুমপান করলে আমরাও ধুমপান করতাম। ওরা সালাত বাদ দিয়ে ঘুমালে আমরাও সালাত বাদ দিয়ে ঘুমাতাম। ওরা পিতামাতাকে কষ্ট দিলে আমরাও পিতামাতাকে কষ্ট দিতাম।

চতুর্থত : وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ. حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِيْنُ [হ্যাঁ, আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করি। আমাদের নিকট মৃত্যু আগমন করা পর্যন্ত।]

আল্লাহ বলেন,

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ

[ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো কাজে লাগবে না।]

হ্যাঁ, আল্লার কসম! যদি সমস্ত নবী, রসুল একত্র হন এবং তাঁদের সঙ্গে ফেরেশতারাও একত্র হন, তারপর যদি সবাই মিলে কোনো কাফেরের জন্য সুপারিশ করে, তথাপি আল্লাহ তাঁদের সুপারিশ কবুল করবেন না। কাফেরদের পক্ষে কারও কোনো সুপারিশ সেদিন কাজে আসবে না।

আনুগত্য করব, কিন্তু কার!

হিজাব ও পর্দাকে যেসব দেশ না জেনে না চেনে ঘৃণা করে, তেমনই এক দেশের এক ঘটনাপ্রবাহ এখানে তুলে ধরছি–

হিন্দা ছোট্ট এক কিশোরী। স্কুলে যাওয়া-আসা করে লম্বা ও শালীন পোশাক পরে। কিন্তু এ পোশাকে শিক্ষিকা ওকে দেখলেই রাগ করে । বলে,

এসব চলবে না, তোমাকে সবার মতো খাটো পোশাক পড়ে আসতে হবে। বুঝলে?

একদিন শিক্ষিকা একটু বেশি রাগ হয়ে যান। হিন্দার মনও ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। ও বাড়ি যায় কেঁদে কেঁদে। অশ্রুসিক্ত নয়নে চোখ মুছতে মুছতে মাকে বলে,

শিক্ষিকা আমাকে আমার লম্বা পোশাকের কারণে স্কুল থেকে বের করে দিয়েছেন!

মা বলে, আমার মামণি! মন শক্ত রাখো! তুমি যে পোশাক পরেছ, তা আল্লাহর হুকুমে পড়েছ। শিক্ষিকা রাগ করুক আর যাই করুক– এ পোশাক তুমি কোনো প্রকারেই ছাড়তে পারো না।

কিশোরী বলে, তা তো বুঝলাম! কিন্তু শিক্ষিকা যে মানছেনই না!

মা বলে, ভেবে দেখো, কার কথা শুনবে তুমি! শিক্ষিকার কথা, না আল্লাহর কথা! আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সুন্দর আকৃতি দান করেছেন। তোমাকে অসংখ্য নেয়ামত দ্বারা ঘিরে রেখেছেন। মানবে কার হুকুম? আল্লাহর হুকুম, না, কোনো মানুষের চাপিয়ে দেওয়া

হুকুম! মানুষ তোমার কোনো উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারবে না, যদি না চান আল্লাহ!

মেয়েটি তখন মাকে বলে,

আমি আল্লাহর হুকুমই মানব। তাঁর কথাই শুনব।

পরদিন মেয়েটি স্কুলে যায়। আগের সেই লম্বা ও শালীন পোশাক পরে। শিক্ষিকা ওকে দেখামাত্রই কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করে। মেয়েটি কেঁদে দেয়। বলে,

জানি না, আমি কার আনুগত্য করব? আপনার, না তাঁর!

শিক্ষিকা বলে, তাঁর মানে; কার?

কিশোরী বলে, আল্লাহর! আমি যদি আপনার আনুগত্য করি, তাহলে আমার আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন, আর যদি আমি আল্লাহর কথা মানি তাহলে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন! কার কথা মানব আমি?

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিকা কান্নায় ভেঙে পড়েন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তওবা করেন। বাকরুদ্ধ হয়ে সস্নেহে প্রিয় ছাত্রীকে জড়িয়ে ধরেন এবং বলেন,

তুমি বরং আল্লাহর আনুগত্য করো! শুধু আল্লাহর আনুগত্য! অন্য কারও নয়। এ কথা বলার জন্য আমি লজ্জিত। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও! আমি বুঝতে পারিনি, হে আমার আদরের ছোট্ট মামণি!

কিন্তু তুমি! তুমি হে নারী! তুমি কার অনুসরণ করবে? পাশ্চাত্যের চাপিয়ে দেওয়া ফ্যাশনের, না ইসলামের শাশ্বত বিধান হিজাবের? অবশ্যই হিজবের। এতে যদি তোমার শিক্ষিকা

তোমাকে ক্লাস থেকে বের করে দেয়! হাসতে হাসতে বের হয়ে এসো। গর্বভরে বুক ফুলিয়ে বের হয়ে এসো। এমন শিক্ষিকার কাছে কেন পড়বে তুমি, যিনি তোমাকে আল্লাহর হুকুম মানতে বারণ করেন? পর্দাকে বিদ্রূপ করেন? এমন শিক্ষিকার কবল থেকে আল্লাহ্ যে তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, এ জন্য তুমি হাসবে, গর্ব করবে। দুনিয়া অর্জনের পড়া দুনিয়াদারের কাছে পড়তে গিয়ে যদি দীনই রক্ষিত না থাকে, তাহলে এমন পড়াকে হাসতে হাসতে বিদায় বলো। কাঁদবে না। কাঁদলে তুমি হেরে যাবে। কান্না কি তোমার জন্য শোভা পায়? তুমি তো দীন পালনের জন্য দুনিয়া হারিয়েছ! দীন পেয়ে দুনিয়া হারিয়ে হাসবে, না দীন হারিয়ে দুনিয়া পেয়ে হাসবে? ভাবো, আরেকবার ভাবো!

কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক মহিলা...

আমরা এক পারিবারিক সফর শেষে মাগরিবের একটু আগে বাড়ি ফেরার রাস্তা ধরি। বাড়ি আসার পথে আমার স্বামী এক কবরস্থানের প্রাচীরবেষ্টনীর কাছে থাকা এক মসজিদের কাছে গাড়ি থামিয়ে নামেন। রাত নেমে আসে। আমি একাকী গাড়িতে বসে থাকি। হঠাৎ আমার অনুভব হয়, আমার শরীর কাঁপছে। যেন মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। একটু পরই দুনিয়াকে বিদায় জানাতে হবে! আমি তাকাই কবরস্থানের দিকে। হায়! দুনিয়া কত ক্ষণস্থায়ী! কত আপনজনই তো এরই মধ্যে ছেড়ে গেছে দুনিয়া! কয়েকদিন আগেও তারা মাটির ওপর ছিল। আজ তারা মাটির নীচে। প্রতিদিন হাজার হাজার জানাজা। তারা সাদা কাপড়ে

আবৃত হয়ে চলে যাচ্ছেন পরদেশে। মাটির ঘরে। সেখানে একাই মুখোমুখি হতে হচ্ছে শেষ পরিণতির। ভালো কিংবা মন্দ। ভালো হলেও তার কোনো শেষ নেই। মন্দ হলেও তার কোনো শেষ নেই। আত্মীয়স্বজন কিছুদিন তাদের মনে রাখে। তাদের স্মরণে অশ্রু বিসর্জন দেয়। একসময় ভুলে যায়।

এ প্রাচীরের আড়ালে তো শুয়ে আছেন কত মানুষ। কেউ ছিলেন আমির, কেউ ফকির। কেউ মনিব, কেউ গোলাম। কেউ রাজা, কেউ প্রজা। কেউ দুর্বল, কেউ সবল। কেউ জালিম, কেউ মজলুম। এখানে এসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সকল পার্থিব পরিচয়। তবে নেককার ও বদকারের যথাযথ বদলা কিন্তু সবাই এখানেই পাবে।

হে আল্লাহ! এখন যদি আমার জীবনস্পন্দন থেমে যায়! বাড়িতে আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে যদি সমাহিত হই এখানের কোনো এক সঙ্কীর্ণ কবরে! যেখানে নেই কোনো সুজন-স্বজন, নেই কোনো প্রিয় মানুষ কিংবা ঘনিষ্ঠজনের কোনো পরশ! আছে শুধু অন্ধকার! মুনকির-নাকিরের প্রশ্নবাণ! কঠিন জিজ্ঞাসাবাদ! আর আমার পরিবারপরিজন? ভেজা চোখে ওরা আমাকে মাটিচাপা দিয়ে ধীরে ধীরে চলে যাবে। কিছুদিন পর ভুলে যাবে আমার স্মৃতি। একেবারে ভুলে যাবে। আল্লাহ সত্য বলেছেন,

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا.

কেয়ামতের দিন তার নিকট সবাই আসবে একা একা অবস্থায়।

হে সুরক্ষিত মহামূল্যবান সম্পদ সর্বশেষ তোমাকে বলতে চাই–

হ্যাঁ, তোমার কানে কানে কিছু কথা বলে আমি এবার বিদায় নিব। আশা করি আমার কথা তোমার কান স্পর্শ

করার আগে তোমার হৃদয় স্পর্শ করবে।

সংখ্যায় যতই পাপাচারিনীরা বাড়ুক না কেন? তুমি বিভ্রান্ত হবে না। পর্দা নিয়ে যারা অবহেলা করে কিংবা বাঁকা চোখে দেখে, কিংবা যুবকদের ধরতে ফাঁদ পাতে কিংবা অবৈধ প্রণয়ের অন্ধকার পৃথিবীতে হারিয়ে যায়, হারামের ভেতর খুঁজে তৃপ্তি, নাটক সিনেমায় কাটিয়ে দেয় জীবনের মহামূল্যবান সময়, জীবনযাপন করে লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন, তাদের সংখ্যাধিক্যেও ভেঙ্গে পড়বে না তুমি। বিভ্রান্ত হবে না তুমি। পরিষ্কার ভাষায় তোমাকে বলতে চাই, আমরা বাস করছি এমন এক যুগে, যখন সর্বত্র ফেতনা-ফাসাদের জয়জয়কার। মুমিনের সঙ্কট সবখানে, বিভিন্ন আকৃতিতে, বিভিন্ন অবয়বে। এখানে চোখের ফেতনা, ওখানে কানের ফেতনা। এখানে একজন পসরা মেলে বসেছে অশ্লীলতার, ওখানে একজন দোকান খুলেছে পাপাচারের। কেউ আবার ডাকছে অবৈধ সম্পদের দিকে। পাপের বাজারের রমরমা অবস্থা দেখে মনে হয়, আমাদের যুগটা যেন সেই যুগের কাছে চলে এসেছে, যে যুগ সম্পর্কে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ.فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ.

তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে ধৈর্যের দিন। তখন ধৈর্য ধরা মানে, হাতের মুঠোয় কয়লা ধরা। তখনকার সৎকাজের বিনিময় এখনকার থেকে পঞ্চাশগুণ বেশি হবে। –[সুনানে আবু দাউদ : ৪৩৪৩]

শেষ যুগে আমলেসালেহকারীর বিনিময় বহুগুণ বেড়ে যাবে। কারণ, তখন সৎকর্মসম্পাদনে কোনো বন্ধু পাওয়া যাবে না, মিলবে না কোনো সাহায্যকারী। পাপাচারীদের জয়জয়কারে নেকআমলকারী হবে নিঃসঙ্গ, অপরিচিত। পাপাচারীরা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পাপাচার করবে। আর নেক আমলকারী (রা.) তাদের দাপটে শুধু কাঁদবে নীরবে।

তারা গান শুনবে। গানের আসর বসাবে। আর নেকআমলকারীরা তো গানও শুনবে না, আসরও বসাবে না। তারা পরনারীকে দেখে দেখে চোখের জ্বালা মেটাবে। আর নেকআমলকারীরা অবনত চোখে নীরবে পথ চলবে। তারা লিপ্ত হবে– জাদুবিদ্যা চর্চায় ও শিরকে। আর নেকআমলকারী অটল-অবিচল থাকবে ইমান, ইয়াকিন ও তাওহিদে। মুসলিম শরিফের হাদিস– আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

بَدَأَ الْإِسْلَام غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَأَ ، فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ.

ইসলাম শুরু হয়েছে অপরিচিত ও অচেনা অবস্থায়। আবার ইসলাম ফিরে যাবে আগের সেই অবস্থায়। কিন্তু সুসংবাদ ইসলামকে আকড়ে ধরে থাকা সেই অপরিচিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত ও অচেনাদের জন্যই। [সহিহ মুসলিম : ২৬৯৬]

সহিহ বুখারির হাদিস। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ

তোমাদের সামনে যে সময় আসবে তা আগের সময়ের তুলনায় আরও খারাপ হবে। এ অবস্থা চলতে থাকবে তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্বপর্যন্ত। [হাদিস নং ৭০৬৮]

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

عِزَّتِيْ لَا أَجْمَعُ عَلٰى عَبْدِيْ خَوْفَيْنِ وَ أَمْنَيْنِ إِذَا أَمِنَنِيْ فِي الدُّنْيَا أَخِفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ إِذَا خَافَنِيْ فِي الدُّنْيَا أَمَنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কসম আমার ইজ্জতের! আমার বান্দার ওপর এক সঙ্গে আমি দুটি ভয় ও দুটি সুখ একত্রিত করব না। দুনিয়াতে আমাকে ভুলে গিয়ে সে যদি উদাসীন থাকে, তাহলে কেয়ামতের দিন আমি তাকে ভয়ের মুখোমুখি করব। আর

যদি দুনিয়াতে সে আমাকে ভয় করে, তাহলে আমি আখেরাতে তাকে সুখ ও নিরাপত্তা দান করব।

হ্যাঁ, যে আল্লাহকে ভয় করবে ইহকালে, মর্যাদা দেবে হালালকে হালাল হিসেবে, আর হারামকে হারাম হিসেবে, সে কেয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে। আল্লাহর দীদার লাভ করে ধন্য হবে। অবশ্যই জান্নাত হবে তার শেষ ঠিকানা।

এই জান্নাতবাসীদের জন্যই বলেছেন আল্লাহ,

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٥) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (٢٧) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (٢٨)

তারা একে অপরের দিকে মুখ করে কথোপথন করবে। তারা বলবে, আমরা ইতঃপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে ভীত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম। তিনি সৌজন্যশীল ও পরম দয়ালু। [সুরা তুর : ২৫]

পক্ষান্তরে যারা অপরাধে গা ভাসিয়ে দেবে, যাদের দিবানিশির চিন্তা হবে পেট-লালসা ও যৌন-লালসা এবং আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে যারা থাকবে ভ্রূক্ষেপহীন ও বেপরোয়া। আখেরাতের ভয়ংকর পরিণতি তাদের গ্রাস করবেই।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (٢٢)

তুমি জালিমদের ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবে, তাদের কৃতকর্মের কারণে। আর এটিই আপতিত হবে তাদের ওপর। যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাঁরা থাকবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। তাঁরা যা চাইবে, তাঁদের প্রতিপালকের নিকট, তাই তাঁদের দেওয়া হবে। বলা হবে, এটি তাঁর মহাঅনুগ্রহ। [সুরা শুরা : ২২]

সুতরাং বিভ্রান্ত হয়ো না। ভয় পেয়ো না।

যদি দেখ, পথহারা নারীদের সংখ্যাই বেশি। আর দীনের ওপর অটল-অবিচল মহীয়সীদের খুঁজে খুঁজে বের করতে হয়, তাতেও তুমি ভেঙে পড়ো না।

যদি দেখ, আধ্যাত্মিকতার সোপান বেয়ে ওপরে ওঠা নারীদের সংখ্যা একেবারেই স্বল্প, তাতেও তুমি একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করো না। হে আদর্শ প্রজন্ম গড়ার কারিগর! হে শ্রেষ্ঠ মানুষ গড়ার পুণ্যব্রতী! হে সমাজ গড়ার রানি! আমার এ উপদেশমালা তোমার হস্তে সঁপে দিলাম। আমার গোপন ও লুকায়িত সংগ্রহশালা থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে। তাতে নেই কোনো ভেজাল, নেই কোনো ভণিতা। আল্লাহর কাছে আমার নিবেদন– আল্লাহ যেন তোমাকে হিফাজত করেন। নিরাপদে রাখেন। তুমি হও এ যুগের আয়শা-খাদিজা। ফাতেমা-হাজেরা। যেখানেই থাকো তুমি আমাদের বোন। আমরা সর্বাবস্থায় তোমার কল্যাণ চাই। দিবানিশি সবসময় তোমার কল্যাণ চেয়ে আমরা হাত ওঠাব, আকাশের ঠিকানায়। মহান আল্লাহর দরগায়। তোমাকে উপদেশ দানে কিংবা তোমার রক্ষণাবেক্ষণে আমরা সব সময় সংকল্পবদ্ধ। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার কল্যাণ কামনায় আমাদের

চিন্তা ও শ্রমকে নষ্ট করবেন না। তুমি যেদিন আলোর পথে উঠে আসবে এবং অন্যকেও ডাকবে, সেদিনই আমাদের মুখে হাসি ফুটবে। প্রাপ্তির হাসি। তৃপ্তির হাসি।

সালাম তোমায় হে নারী! সালাম! আল্লাহর রহমত তোমার সঙ্গী হোক নিত্য। তারই বরকত হোক তোমার নিরন্তর পাথেয়।

বিদায়!

পর্দা করতে
তোমার যদি লজ্জা লাগে
তবে পুরুষদের খারাপ ও লোলুপ দৃষ্টি
যখন তোমার সস্তা দেহের ওপর পড়ে,
তখন কোথায় থাকে তোমার লজ্জা,
কোথায় থাকে আত্মমর্যাদাবোধ!

আপনার হিজাব,
আপনার হিজাব,
হে সুশীলা ও সম্ভ্রান্ত নারী!

হিজাব কেবল লজ্জা ঢাকার পোশাক নয়; এটি তো আপনার ইমান। আপনার আশ্রয়। আপনার ধর্ম। অনন্তর এটি আপনার লজ্জাশীলতার প্রকাশ। বোন আমার, আপনি তো এই লজ্জাশীলতার কারণে অনেক পুরুষকেও ছাপিয়ে গেছেন। তাই তো একজন লজ্জাশীল পুরুষের ব্যাপারে বলা হয়, 'তিনি পর্দানশীল গৃহবাসিনী কুমারী নারী থেকেও বেশি লাজুক ছিলেন।'

আপনিই সেই কুমারী,
হিজাবই আপনার আশ্রয়
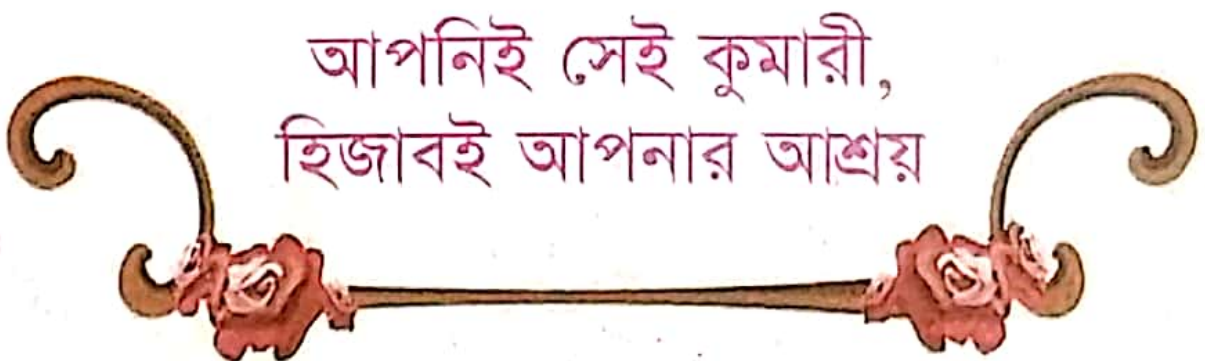
অল্প বয়সেই বক্তৃতা ও লিখনীর মাধ্যমে আরব-অনারব সর্বত্রই সাড়া ফেলে দিয়েছেন। পশ্চিমা দুনিয়ায়ও ইসলামি রেনেসাঁর অগ্রদূত হিসেবে যার পরিচিতি ছড়িয়ে পড়েছে খুব দ্রুত। তিনি হলেন আরবজাহানের বিশিষ্ট দাঈ শায়খ ড. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আরিফি।

জন্ম ১৬ জুলাই ১৯৭০। জন্মসূত্রে তিনি ইসলামের বিখ্যাত সেনানায়ক খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.)-র বংশোদ্ভূত।

প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন সৌদি আরবের দাম্মাম শহরে। তারপর উচ্চতর পড়াশোনা করেন সৌদি আরবেরই বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে। ১৪২১ হিজরি মুতাবিক ২০০২ ঈসায়িতে রিয়াদের 'বাদশাহ সউদ বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে The views of Shaykul Islam Ibne Taymiyah on Sufism. a compilation and study বিষয়ের ওপর পিএইচডি লাভ করেন।

শায়খ আরিফির বরেণ্য শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম হলেন, প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল, শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে কুউদ ও শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে নাসের আল বাররাক।

ইলমে ফিকহ ও ইলমে তাফসির পড়েন শায়খ আব্দুল আজিজ ইবনে বাজ (র.)-র কাছে। এবং শায়খ ইবনে বাজ (র.)-র-ই সান্নিধ্যে আরও ষোলো বছর অবস্থান করে ধর্মীয় জ্ঞানের ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

ডক্টর আরিফি জীবনের মূলকাজ হিসেবে বেছে নিয়েছেন 'দাওয়াত ইলাল্লাহ'কে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় মানবজাতির হেদায়েতের উদ্দেশে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন।

এ ছাড়াও তিনি রিয়াদের 'বাদশা সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে'র প্রফেসর এবং আল বাওয়ারিদ জামে মসজিদের খতিব। জুমার সালাতে সেই মসজিদে থাকে মুসল্লিদের উপচে পড়া ভিড়।

ডক্টর আরিফি দাওয়াহ বিষয়ক বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইসলামি অর্গানাইজেশনেরও মেম্বার। রাবেতা আলমে ইসলামি ও বিশ্বমুসলিম ওলামা ঐক্যপরিষদের সদস্যপদ তাঁর বিশেষ অর্জনের একটি।

সুসাহিত্যিক ডক্টর আরিফি একজন সুবক্তাও বটে। তাঁর বক্তৃতার অনেক অডিও-ভিডিও ইন্টারনেটমাধ্যম গুগল, ফেসবুক, ইউটিউবসহ সর্বত্র পাওয়া যায়। যেগুলো শ্রবণে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ইমান নবউদ্যমে জাগ্রত হয়।

চুয়াল্লিশ বছর বয়সে এ বিজ্ঞ আলেম প্রায় পঁচিশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেগুলোর প্রত্যেকটিই জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে। বক্ষ্যমান গ্রন্থটি তার অনন্য গ্রন্থের একটি। এটি পৃথিবীর অনেক ভাষায় ভাষান্তর হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাও হলো রূপান্তর।

আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচারের পাশাপাশি লেখক ও অনুবাদকের দীর্ঘায়ু কামনা করছি। আমিন।

মুহাম্মদ দিলাওয়ার হুসাইন
পরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন

O Woman! When you are a Queen.

হে আমার স্বামী, এ গ্রন্থটি কি আমি পড়ব?

আমি বাংলাদেশের নামকরা এক পুস্তকবাজারে ঘুরতে যাই। যে বাজারের কথা বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে সে বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকুক না কেন? জানে। সেই বাজারে ইসলামি বই বিক্রয় হয় এমন একটি মার্কেটে আমি ঘুরে ঘুরে ইসলামি বই দেখতে থাকি। এক লাইব্রেরির সম্মুখ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় হঠাৎ আমার বন্ধু আমাকে বলে, এই লাইব্রেরি নতুন হয়েছে; কিন্তু অল্প দিনেই ভালো ভালো বই বের করার জন্য সুনাম অর্জন করে ফেলেছে। আমি দাঁড়াই। উল্টেপাল্টে বিভিন্ন বইয়ের ওপর চোখ বুলাই। তবে আমার একটি বইয়ের ওপর চোখ যায় আটকে। বইটির নাম, 'নারী যখন রানি'! কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থাকি। মনে মনে ভাবি, ও আচ্ছা বইটি লেখা হয়েছে নারীদের জন্য, আমরা পুরুষদের জন্য নয়। ক্রয় করি না। ঘুরে ফিরে চলে আসি বাসায়। বাসায় ঢুকতেই আমার স্ত্রী আমার সামনে উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে বলে ওঠে, তুমি বাসায় নেই, আমার মন ভীষণ খারাপ! তাই আইফোন নিয়ে বসি। ঢুকে যাই ফেসবুকে। দেখি, নতুন একটি ইসলামি বই বাজারে এসেছে। নাম তার 'নারী যখন রানি'! আমি আনন্দে আত্মহারা। আমরা কীভাবে রানি হব? সে বিষয়ে লেখা, একটি বই প্রকাশ হয়েছে। আমরা কীভাবে পর্দা করব? সে বিষয়ে লেখা হয়েছে এই বইতে। আমি মনে মনে ভাবি, আমার স্বামী বাসায় আসতেই আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করব, হে আমার স্বামী, আমি কি এ গ্রন্থটি পড়তে পারি? আমাকে কি তুমি এনে দিবে এ গ্রন্থটি? স্বামী বলে, হায় আফসোস! আমি তো এই মাত্র বইটি ...... হ্যাঁ, ঠিক আছে অবশ্যই তুমি পড়তে পারো। আমি এনে দিব তোমাকে এই বইটি। বইটি বাসায় আনা হয়। আমি পুরো বইটি পড়ি। তারপর তাঁকে বলি, হায়! এ বইটি তো সব পুরুষেরও পড়া উচিত! কারণ, নারী-পুরুষ উভয়েরই জীবন পাল্টে দিতে পারে এ বইটি। পড়া হোক এ বইটি সবার। এ প্রত্যাশা রইল আমার।

— মাওলানা মাহমুদ হাসান কাসেমি